সাহাবীদের ইসলামগ্রহণের গল্প

মুহাম্মাদ আদম আলী

"

একজন মুসলিমের জীবন
এমন হওয়া উচিত যেন
তাকে হত্যা করতে আসা
শত্রুও তার সান্নিধ্য থেকে
কিছুটা হলেও উপকৃত হতে
পারে এবং ফিরে যাওয়ার
আগে সে ভিন্ন মানুষে
পরিণত হয়।

"

সাহাবীদের ইসলামগ্রহণের গল্প

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়া এবং তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদের মাহাত্ম্য স্বীকার করা এবং তাদের অনুসরণ করা। এজন্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরতে হবে। বস্তুত তারা হেদায়েতের সরল পথে ছিলেন।

নবুওয়াত লাভ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছিলেন। তারপর একে একে মহান সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। কেমন ছিল সেইসব সাহাবীদের ঈমান আনার গল্প? এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বইটি রচনা করা হয়েছে।

সকল সাহাবীর ইসলামগ্রহণের গল্প ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়নি। তবে যেসব সাহাবীর ইসলামগ্রহণের ঘটনা বিস্তারিত জানা যায়, সেগুলো খুবই আশ্চর্যজনক এবং শিক্ষামূলক। তাদের মধ্যে এ গ্রন্থে বারোজন বিশিষ্ট সাহাবীর ইসলামগ্রহণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনাই গল্প আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণির পাঠকই উপকৃত হতে পারেন। এ গ্রন্থটি রচনায় নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি

অনুসরণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠকগণ দ্বীনের পথে নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন, ইনশাআল্লাহ।

সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব পাণ্ডুলিপিটি দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
লেখক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

০৩ নভেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے
وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

যারা নিজেরাই সুপথের ওপর ছিল না,
তারাই অন্যদের জন্য হয়ে গেল পথপ্রদর্শক।
কি দৃষ্টিই না ছিল তার—
যা দিয়ে মৃত আত্মাকেও জীবন্ত করে তুলতেন তিনি।

সালমান আল-ফারসী রা.-এর ইসলামগ্রহণ

এক সময় পৃথিবীতে মানুষ দীর্ঘ হায়াত পেত। হাজার বছর কিংবা তারও বেশি। সেটা কমে কমে এখন একশ'র নিচে চলে এসেছে। কেউ কেউ একশ'র বেশিও বাঁচে। তখন সেটি খবর হয়ে ওঠে। সালমান আল-ফারসী এরকম একজন। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। কয়েকশ বছর। তার যুগে অন্য কেউ এত হায়াত পাননি। দীর্ঘ জীবনের ঘটনাও দীর্ঘ হয়। এজন্য তার ইসলামগ্রহণের ঘটনা এক-দুইদিনের নয়; বরং শত বছরের। আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলে একটি গ্রামের নাম জায়ান। এ গ্রামেই তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। যুবক বয়স পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। তার বাবা ছিলেন গ্রামের সর্দার। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। ধনীদের বিভিন্ন বাতিক থাকে। তার বাবারও ছিল। কী এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রিয় ছেলেকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। পায়ে বেড়ি পর্যন্ত পরালেন। যুবক বয়সে বন্দিত্ব ভালো লাগার কথা নয়। সালমানেরও ভালো লাগল না। একদিন সুযোগ বুঝে ঘর ছেড়ে পালালেন।

স্রষ্টার ইবাদতে খুব আগ্রহ ছিল সালমানের। এজন্য জীবন উৎসর্গ করতে চাইতেন। পিতার ধর্ম ছিল মাজুসী। তিনি আগুনের পূজা করতেন। আর সারক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সালমানকেই। এসব কাজে তার আগ্রহের কমতি ছিল না। একদিন গ্রামের এক গীর্জায় ঢুকে পড়েন তিনি। তাদের প্রার্থনা-পদ্ধতি তার মন কেড়ে নেয়। সেই থেকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তখন এ ধর্মের উৎস ছিল শামে। তিনি স্থানীয় খ্রিস্টানদের সহায়তায় দামেস্কে পাড়ি জমান।

দামেস্কে তিনি নতুন। এই প্রথম গ্রামের বাইরে কোথাও এলেন। কাউকেই চেনেন না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে এক গীর্জায় গিয়ে উঠলেন। গীর্জার পুরোহিতকে নিজের বাসনা বললেন : 'আমি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খিদমত করা, আপনার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করা।' এতে পুরোহিত রাজি হলো। তিনি তার সঙ্গে থাকা শুরু করলেন।

ধনীর আদরের দুলাল ছিলেন সালমান। সবছেড়ে এই বৈরাগ্য জীবনেই তিনি শান্তি খুঁজে পেলেন। কিন্তু এ শান্তি বেশিদিন টিকল না। পুরোহিতের কর্মকাণ্ড তার ভালো লাগল না। ধর্মীয় নেতা হতে হলে সৎ হতে হয়। পুরোহিতটা মারাত্মক অসৎ। অসৎ লোকের সঙ্গে থাকা মুশকিল। সেবা করা আরও কঠিন। অন্য কোথাও যাবেন, সে উপায়ও নেই। বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে লাগলেন।

সালমানের ভাগ্য বরাবরই সুপ্রসন্ন। কিছু দিনের মধ্যেই অসৎ লোকটি মরে গেল। তার জায়গায় এলো নতুন পুরোহিত। নতুন মানুষটিকে তার ভালো লাগল। তিনি দুনিয়া-বিরাগী এবং ইবাদতগুজার; সঠিক খ্রিস্টধর্মের প্রচারক এবং ধারক।

সালমান সর্বস্ব দিয়ে তার সেবা করতেন। দুজন আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠেন। এভাবে লম্বা একটা সময় অতিবাহিত হলো। তারপর সেই পুরোহিত ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর আগে সালমানকে আরেকজন পুরোহিতের সন্ধান দিয়ে গেলেন। সেই পুরোহিত থাকেন মাসুলে। এখন তাকে মাসুলে যেতে হবে। তিনি গেলেন।

সালমানের আবার নতুন জীবন শুরু হলো। মাসুলের লোকটিও ভালো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনিও পরপারে পাড়ি জমান। এবার সন্ধান পেলেন নাসসিবিনে আরেক পুরোহিতের। গেলেন। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এ পুরোহিতও বেশিদিন বাঁচলেন না। তিনি মৃত্যুর আগে সালমানকে বললেন, 'অমুক নামে আমুরিয়্যাতে এক লোক আছেন। তুমি তার সাহচর্য অবলম্বন করো। এ ছাড়া আমাদের এ সত্যের উপর অবশিষ্ট আর কাউকে আমি জানি না।'

জীবন উৎসর্গিত না হলে কেউ এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকে না। এ পর্যন্ত চারজন পুরোহিতের সঙ্গ লাভ করেছেন। খ্রিস্টধর্মের যাবতীয় বিষয়াদি, গির্জার নানা কর্মকাণ্ড, প্রার্থনা পদ্ধতি, উৎসব—কোনো কিছুই শেখা বাকি নেই। চাইলেই তিনি এখন পুরোহিত সেজে বিলাসী জীবন কাটাতে পারেন। কিন্তু তিনি শিষ্যত্বকেই বেছে নিলেন। আমুরিয়্যাতে গিয়ে হাজির হলেন। ওই লোককে খুঁজে বের করলেন। তার সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল।

নতুন পুরোহিত লোকটি আগের তিনজনের মতো একই পথ ও মতের অনুসারী। সালমানের ভালো লাগল। তবে এ ভালো লাগাও বেশিদিন টিকল না। অদৃশ্যের ইশারায় তিনিও খুব দ্রুত

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেলেন। এ সময় সালমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অবস্থা তো আপনি ভালোই জানেন। এখন আমাকে কী করতে বলেন, কার কাছে যেতে পরামর্শ দেন?'

পুরোহিত বললেন, 'বৎস, আমরা যে সত্যকে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের ওপর ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তবে অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আসবেন। তিনি তার জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড়বড় কালো পাথরের যমীনের মাঝখানে খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শনও তার থাকবে। তিনি হাদিয়ার জিনিস তো খাবেন, কিন্তু সদাকার জিনিস খাবেন না। তার দুকাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তুমি পারলে সে দেশে যাও।'

এরপর পুরোহিত মারা গেলেন। এখন সালমান পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এখন গন্তব্য অনেকদূর। পথ চেনা নেই। একা একা যাওয়াও সম্ভব নয়। কোনো কাফেলা পেলে সহজ হতো। আরবরা এখানে ব্যবসা করতে আসে। সবসময় আসে না। বছরের নির্দিষ্ট কিছু মাসে আসে। এরকম কোনো আরব কাফেলার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সব অপেক্ষাই একদিন শেষ হয়। সময় এমনই। সালমানের অপেক্ষাও শেষ হলো। একটা আরব কাফেলা পাওয়া গেল। আম্মুরিয়াতে থাকাকালে তিনি কিছু গরু ও ছাগলের মালিক হয়েছিলেন। সেগুলোর বিনিময়ে কাফেলার লোকজন তাকে নিতে রাজি হলো।

কাফেলার লোকজন কেমন, সালমানের তা জানার অবকাশ ছিল না। তখন আরবদের চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। এ কাফেলার লোকজনও তেমন। তারা সালমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ওয়াদী-আল-কুরা নামক স্থানে তাকে এক ইহুদীর নিকট বিক্রি করে দিল। এভাবে বিক্রি হয়ে গেলে মানুষ আর স্বাধীন থাকে না। দাস হয়ে যায়। সালমানও দাস হয়ে গেলেন।

ওয়াদী-আল-কুরা হচ্ছে মদীনা ও শামের মধ্যবর্তী একটি জায়গা। মাঝপথে এসে তাকে এখন একজন ইহুদীর দাসত্ব করতে হচ্ছে। তবে এ অবস্থা বেশিদিন চলেনি। অল্পদিনের মধ্যেই ওই ইহুদীর এক চাচাতো ভাই বেড়াতে এলো। সে ইয়াসরিবে বনু কুরাইযা গোত্রে বসবাস করে। সালমানকে তার পছন্দ হলো এবং খরিদ করে নিল। পণ্য আর মানুষ বিক্রিতে তখন কোনো তফাৎ ছিল না।

সালমানের মনিব পাল্টে গেল। এ ব্যাপারে দাসদের কিছু করার থাকে না। তবে সালমান এতে খুশি হলেন। শীঘ্রই তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। হলোও তা-ই। নতুন মনিবের সঙ্গে তিনি ইয়াসরিবে এসে পৌঁছলেন। তার চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। এ আনন্দ তখন দেখার কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি তার কাঙ্ক্ষিত শহরে এসে পৌঁছেছেন। খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমি—ইয়াসরিব (মদীনা)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে এখন কুবায় অবস্থান করছেন। চারদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ইহুদীদের পল্লীতেও এ খবর ঢেউ তুলেছে। সালমান তখন

খেজুর গাছের চূড়ায়। খেজুর সংগ্রহ করছেন। দাস হিসেবে এটি ছিল তার স্বাভাবিক কাজ। দাসত্বের শৃঙ্খল তাকে তার অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। সর্বশেষ নবীর আগমনের অপেক্ষা করছেন। তার সঙ্গে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এটা যে ঘটবে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তবে সেই প্রতিক্ষিত নবী যে তার শহরেই এসে পড়েছেন, এখনো তিনি তা জানার সুযোগ পাননি।

একটু পরেই একজনকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলেন। কাছে আসতেই তাকে চেনা গেল। লোকটি তার মনিবের ভাতিজা। তার আসার ভঙ্গি একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। উত্তেজনা আর আবেগে সে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে। হয়তো নতুন কোনো সংবাদ জানাতে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাজের ফাঁকে সালমান লোকটিকে লক্ষ্য করছে। সে চিৎকার করতে করতে বলছে : 'হে অমুক...!'

তার মনিবকেও খুব উত্তেজিত মনে হলো। সে এসব হইচইয়ের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

লোকটি অবশেষে তাদের নিকটে এসে দম নিল। তারপর বলল, 'আল্লাহ বনী কায়লাকে (আউস ও খাযরায গোত্র) ধ্বংস করুন। আমি কেবলই সেখান থেকে এসেছি। আল্লাহর কসম, তারা এখন কুবাতে মক্কা থেকে আজই আগত এবং ব্যক্তির কাছে সমবেত হয়েছে, যে কিনা নিজেকে নবী বলে মনে করে।'

অবিশ্বাস্য কিছু শুনলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। আর যদি তা সত্য হয়, তাহলে সে হুঁশ হারিয়ে ফেলে। সালমানের এখন

সেই অবস্থা। আনন্দের আতিশয্যে তার শরীর কাঁপছে। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। মনে হলো, তিনি গাছের নিচে বসা মনিবের ঘাড়ের ওপর ধপাস করে পড়ে যাবেন! যে মানুষটির জন্য তিনি বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন, সেই মানুষটি এখন তার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর এখন তার স্বাধীনতা নেই। চাইলেই ছুটে যেতে পারছেন না। রাসূলকে দেখার দেরি সহ্য হচ্ছে না তার।

তিনি আর গাছের উপর বসে থাকতে পারলেন না। দ্রুত নিচে নেমে এলেন। মনিবের ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কী বললে—কী সংবাদ?' এ কথা বলতেই মনিব তার গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিল। দাসত্বের শৃঙ্খল বড় কঠিন। তখন মনিবরা দাস-দাসীদের মানুষই মনে করতে না। তাদের আবেগ প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। আবেগ থাকলেও তা লুকিয়ে রাখতে হতো। সালমান তা পারেননি। এটিই তার মনিবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। চড় মেরেই সে শান্ত হয়নি। মারধোরও শুরু করে এবং বলে : 'এর সাথে তোমার সম্পর্ক কী?' তারপর বলল, 'যাও, যা করছিলে তা-ই করো।

সালমানের সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। চোখের পাপড়ি ভিজে উঠল। অসহায়ত্বেরও সীমা থাকে। দাসদের জন্য এর কোনো সীমা নেই। তাদের কষ্ট দেখে কেউ কষ্ট পায় না। সাহায্যও করে না। তিনি আবার খেজুরবৃক্ষে চড়লেন। কাজ করার চেষ্টা করছেন। এত কষ্ট নিয়ে কাজ করা যায় না। কিছু করারও নেই। কতকাল ধরে তিনি সত্য দ্বীন পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছেন। আমুরিয়্যার পুরোহিতের কথা তার মনে পড়ছে। দিবালোকের মতো তিনটি সত্য নিদর্শনের কথা তিনি বলেছিলেন। সেগুলো মিলিয়ে দেখার তীব্র বাসনা তাকে আরও অস্থির করে তুলছে।

সন্ধ্যার আগে তার ছুটি মিলবে না। সন্ধ্যা হতে এখনো অনেক বাকি। আজ যেন সময় যাচ্ছে না। সূর্যের গতি মনে হয়, থেমেই গেছে! পাথরের মতো নিশ্চল শরীরে তিনি কাজ করছেন। সময় যায় সময়ের মতোই। একসময় সূর্য ডুবল। তখনই তিনি কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে। অন্ধকার ক্রমাগত ঘনভূত হচ্ছে। এর মধ্যে তিনি পথ চলছেন। তার দীর্ঘ পথ চলা শেষ হতে যাচ্ছে। দামেস্ক, মাসুল, নুসাইবিন এবং আমুরিয়্যা শেষে এখন এই ইয়াসরিবে। পুরো পৃথিবী তার কাছে অন্যরকম লাগছে। এই রাতে আকাশও বড় বেশি উজ্জ্বল। পূর্ণিমার চাঁদের আলো ভেসে উঠছে—যে আলো তাকে আরেক অপার্থিব আলোর পথ দেখাচ্ছে।

বহু প্রতীক্ষিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এতকাল তিনি যেসব পুরোহিতদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, ভেবেছিলেন—তিনি তাদের মতোই একজন হবেন। কিন্তু তাকে সেরকম লাগছে না। তার চেহারা থেকে জোতির্ময় আলো বের হচ্ছে। এ আলো পুরো কুবাকে আলোকিত করে ফেলেছে। তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

সালমানের কাছে যা ছিল, তিনি তা রাসূলের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি এগুলো আপনার জন্য সদকা হিসেবে সংগ্রহ করেছি। শুনেছি আপনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনার কিছু সহায়-সম্বলহীন সঙ্গী-সাথী আছেন। আমি দেখলাম, অন্যদের তুলনায় আপনিই এগুলো পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।'

সালমান খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জিনিস স্পর্শই করলেন না। তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খাও।'

সালমান ভিন্ন কিছুই জানতে চেষ্টা করছিলেন। তার মাথায় আমুরিয়্যার পাদ্রীর কথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তিনি দেখতে চাচ্ছেন, তার বর্ণনা ঠিক কি না। যেহেতু পাদ্রী বলেছিল যে, তিনি সদকার জিনিস খাবেন না; সুতরাং রাসূল হওয়ার প্রথম শর্তটি মিলে গেছে। তার ঠোঁট থেকে বের হলো : 'এটি প্রথম নিদর্শন! আল্লাহর কসম, তিনি সদকার খাবার খান না।'

তারপর তিনি ফিরে এলেন। পরের দিন আবার কিছু জিনিস সংগ্রহ করে রাসূলের নিকট এসে হাজির হলেন। এবার তিনি বললেন, 'আমি দেখেছি, আপনি সদকার খাবার খাননি। আপনি বিশ্বস্ততা ও দয়া দেখিয়েছেন এবং আমি এটি খুব পছন্দ করি। এবার আপনার জন্য সদকা নয়, কিছু হাদিয়া এনেছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদিয়া গ্রহণ করলেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে তিনি নিজেও সেখান থেকে খেলেন।

দ্বিতীয় নিদর্শনও মিলে গেল। তিনি তার আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না এবং আনমনে বলে উঠলেন, 'এটি দ্বিতীয় নিদর্শন! তিনি হাদিয়ার খাবার গ্রহণ করেন এবং তা থেকে নিজেও খান।'

তারপর আরেকদিন সালমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তখন 'বাকী আল-গারকাদ' কবরস্থানে তার এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। সালমান দেখলেন, রাসূল গায়ে 'শামলা' (এক ধরনের ঢিলা পোশাক) জড়িয়ে বসে আছেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন। তারপর রাসূলের পেছনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আমুরিয়্যার পাদ্রীর বর্ণিত তৃতীয় নিদর্শন—নবুওয়াতের মোহর—খুঁজতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন। তখন সালমান মোহরটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈমানের ঘোষণা দেন।

তখন থেকে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মনিবের কাজের বাইরে বেশিরভাগ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই কাটাতেন।[১]

---

[১] সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু গোলামীর কারণে বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরে রাসূল সা.-এর সহায়তায় দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তারপর তিনি খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনিই পরীখা খননের পরামর্শ দেন। রাসূল সা.-এর সোহবতে তিনি ইলম ও মারেফাতে বিশেষ পাদর্শিতা লাভ করেন। যুহুদ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। জীবনে কোনো বাড়ি তৈরি করেননি। কোথাও কোনো প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। উসমান ইবনে আফফান রা.-এর খেলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার সম্পদের মধ্যে ছিল একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা এবং একটি পানির পাত্র।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ

মানুষটির যেন কোনো ভয়-ডর নেই। কাউকেই পরোয়া করেন না। লম্বা গড়ন। গম্ভীর চেহারা। ঘন দাড়ি। মোঁচের দুপাশ লম্বা ও পুরু। দেখলেই ভয় লাগে। সামান্য ঘটনায় রুদ্র-মূর্তি ধারণ করতে সময় লাগে না। তারপর যা ঘটার ঘটে। এজন্য কেউ তার সামনে দাঁড়াতেও সাহস করে না। এই মানুষটির নাম উমর—মক্কার সবচেয়ে দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া হলেও বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান না হলে সাহস ধরে রাখা যায় না।

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার মুশরিকরা এর বিরুদ্ধাচরণে মেতে ওঠে। তারা মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতনও শুরু করে। এ কাজে উমরও এগিয়ে ছিলেন। তার হাত থেকে কোনোমতে জানে বেঁচেছে তারই এক মুসলিম দাসী। তিনি তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতেন। প্রহার করতে করতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে যেতেন। এ অবস্থায় বলতেন, 'আমি যদি ক্লান্ত না হতাম, তাহলে তোমাকে রেহাই দিতাম না।' সেই ঈমানদার দাসী তখন জবাব দিতেন, 'আল্লাহই তোমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছেন,' কিন্তু উমরের অন্তরে এই কথাগুলোর কোনো প্রভাব দেখা যেত না। তার অন্তর ছিল কঠিন। পাথরের মতো কঠিন। জাগতিক দয়া-মায়ার ধারও ঘেঁষতেন না তিনি।

এর মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ইসলামের উন্নতি তার দৃষ্টি এড়াত না। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের কিছু জটিল সমস্যা

থাকে। তারা সত্য জেনেও অসত্যকে আগলে রাখেন। দুনিয়ার প্রতি যার যত টান, তার মধ্যে অসত্যের পরিমাণও বেশি। তবে একটা সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি দেখতেন, যারাই মুহাম্মাদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে, তারা সত্যিই ভালো মানুষ। একদিন সন্ধ্যায়, তিনি কাবা-চত্বরে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে এলেন। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। তিনি সূরা আল-হাক্কাহ পড়ছিলেন।

এই প্রথম উমর কুরআন শোনার সুযোগ পেলেন। কুরআনের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু তিনি এতে মুগ্ধ হতে চান না। এর ত্রুটি বের করে এই মুগ্ধতাকে পাশ কাটাতে চান। কুরাইশরা নবীকে কত কিছু বলে যে বয়কট করার চেষ্টা করছে, উমর এসব জানেন। তিনি তাদের মতোই মনে মনে বললেন, 'তিনি একজন কবি।' আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : 'এবং এটি কোনো কবির রচনা নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস করো।' (দেখুন, সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৪১)

অদ্ভুত ব্যাপার! তিনি যা চিন্তা করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই এর জবাব পেয়ে গেলেন। এবার তিনি ভাবলেন, 'নিশ্চয়ই লোকটি গণক।' আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করলেন : 'এবং এ কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন করো।' (দেখুন, সূরা হাক্কাহ, ৬৯:৪২)

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। উমর সেখান থেকে দূরে সরে

যেতে পারলেন না। তিনি তা শুনলেন। এক রাশ বিস্ময় ও প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শুনলেন। কোনো কিছুতে আগ্রহ সৃষ্টি হলে মস্তিস্কও ঠিকমতো কাজ করে। উমরের মস্তিস্কও কাজ করতে শুরু করেছে। সর্বনাশা চিন্তার স্রোতে নতুন ঢেউ আছড়ে পড়ছে। পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে উঠছে। তবে উমরের পরিবর্তনের জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। পরদিন সকালেই তিনি তার পুরোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন এবং পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের করুণ অবস্থা নিয়ে চিন্তিত। কুরাইশ নেতাদের কেউ ইসলামগ্রহণ করলে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সাধারণ মুসলিমদের মনোবল বাড়বে। এজন্য তিনি আল্লাহর কাছে ইসলামের চরম শত্রুদের মধ্যে দুজনের জন্য দুআ করলেন—উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম (আবু জাহেল)। তিনি তাদের যে কোনো একজনকে চাইলেন। আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবের দুআ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নিলেন। পরদিনই এর ফল পাওয়া গেল।

মক্কার কুরাইশরা জায়গায় জায়গায় মিটিং করছে। মুহাম্মাদকে আর আগে বাড়তে দেওয়া যায় না। তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কে করবে এই কাজ? দুঃসাহসী উমর উঠে দাঁড়ালেন। সাহসের প্রমাণ রাখতে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর মিলবে না। তাদের জানা নেই, এখানে সাহস দেখানো মানেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। উমরের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটল।

সময়ের পালাবদল—মানুষের কাছে বড় বিস্ময়কর লাগে। এতে তার কোনো হাত থাকে না, কিছু করতেও পারে না। উমর

রওনা হয়েছেন। তার কোমরে উন্মুক্ত তরবারি। গন্তব্য সাফা পাহাড়—ইবনে আরকামের বাড়ি। রাসূলকে হত্যা করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পথে নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমরকে দেখলেন। তিনি ইতোমধ্যে ইসলামগ্রহণ করেছেন। তবে বিষয়টি এখনো গোপনই রেখেছেন। উমরের রণসজ্জা দেখে তিনি ভড়কে গেলেন। অজানা আশঙ্কায় তার মন অস্থির হয়ে উঠল। উমরকে থামানো দরকার। নিশ্চয়ই সে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি করতে যাচ্ছে। মক্কায় এখন মুসলিমরা ছাড়া তার কোনো শত্রু নেই।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ, উমর?

উমর জবাব দিলেন, 'আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি, যে কিনা কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের বেকুফ সাব্যস্ত করেছে, তাদের ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে।'

নুয়াইম রাযিয়াল্লাহু আনহুর আশঙ্কাই সত্য হলো। উমর তো দারুল আরকামের দিকে যাচ্ছে! তাকে ফেরানোর জন্য এখনই কিছু একটা করা দরকার। তিনি বললেন : 'উমর, তুমি ধোঁকার মধ্যে আছ। তুমি কি মনে করো, মুহাম্মাদকে হত্যা করার পর বনু আবদে মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে? তুমি অবাধে বিচরণ করতে পারবে? তুমি বরং নিজের ঘর সামলাও।'

এ কথায় উমর ভীষণ ধাক্কা খেলেন। তিনি দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, আমার ঘরে কী হয়েছে? তুমি কী বলতে চাও?'

—তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইবনে যায়িদ ইবনে আমর এবং তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, আল্লাহর কসম, তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসরণ করে চলেছে। কাজেই পারলে আগে তাদের সামলাও।'

উমারের রাগ আরও বেড়ে গেল। খাত্তাব-পরিবারের কেউ তার অনুমতি ছাড়া ইসলামগ্রহণ করবে, এটা হতে পারে না। যে মুহাম্মাদকে তিনি হত্যা করতে যাচ্ছেন, তাকেই তার পরিবারের সদস্যরা অনুসরণ করে! আগে পরিবারের লোকদের শায়েস্তা করা দরকার এবং সেটা এখনই। তিনি দ্রুত তার গতি পরিবর্তন করলেন। এবার লক্ষ্য রাসূল নন; তার আপন বোন ও বোন-জামাই।

বোনের বাড়িতে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। উমর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কড়া নাড়তে যাবেন, এসময় তার কানে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। আওয়াজটা পরিচিত। কদিন আগে কাবা-চত্বরে রাতের বেলায় মুহাম্মাদের কণ্ঠে যে আওয়াজ শুনেছিলেন, ঠিক সেরকম। উমরের বুঝতে বাকি থাকল না—একই বিষয় পাঠ করা হচ্ছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! এ আওয়াজ শুনলেই অন্তর বিগলিত হতে শুরু করে। উমরেরও ব্যতিক্রম হলো না। তবে তার কঠিন হৃদয় এত সহজে গলতে রাজি হলো না। তিনি সজোরে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ঘরের লোকদের দরজা খুলতে বললেন।

ঘরে মানুষ তিনজন। ফাতিমা ও তার স্বামী সাঈদ এবং খাব্বাব—যিনি তাদের কুরআন শেখাচ্ছিলেন। উমরের কণ্ঠ

শুনেই তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ভয়ে তাদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে আছে। খাব্বাব এখানে বহিরাগত। তাকে দেখলে উমরের রাগ নিশ্চয়ই দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। তিনি দ্রুত ঘরের এক কোণে লুকিয়ে গেলেন। ফাতিমা কুরআনের আয়াত লিখিত মাসহাফটিও লুকিয়ে রাখলেন। এসব কাজ করতে সময় লাগল। দরজা খুলতেও দেরি হলো। উমেরর সন্দেহ বাড়ল। তিনি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যেন কী পড়ছিলে শুনলাম?'

'না, কই! আমরা তো কিছু পড়ছিলাম না। আপনি ভুল শুনেছেন,' ফাতিমার কণ্ঠে ভয় এবং জড়তা। উমর খুবই বিচক্ষণ। তার বুঝতে বাকি থাকে না। তিনি আরও ক্ষেপে গিয়ে বললেন : 'না, আমি ঠিকই শুনেছি। আল্লাহর কসম, আমি শুনেছি, তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ এবং সেটাই অনুসরণ করে চলেছ?'

এ কথা বলতে বলতে উমর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। রাগ সামলাতে না পেরে সাঈদের উপর চড়াও হন এবং তাকে মারাত্মক আঘাত করেন। স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে নিজের বোন ফাতিমাকেও আঘাত করেন। এরকম শক্তপোক্ত মানুষের আঘাত সহ্য করা কঠিন। ফাতিমার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আঘাতে সংঘাত বাড়ে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো। এবার ফাতিমাও যেন জেগে উঠলেন। খাত্তাব পরিবারের রক্তও তার শরীরে বইছে। সে রক্তের দাবি পূরণ করতে তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলেন। মূলত তার হারানোর কিছু নেই। সব যখন প্রকাশ পেয়ে গেছে, এখন আর লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। তিনি তার ভাইয়ের মুখের ওপর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন।'

উমরের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। বজ্রপাতে মানুষ বাঁচে না। আগের সেই উমরও বেঁচে নেই। এখন নতুন উমরের জন্ম হচ্ছে। বোনের দৃঢ়তায় তার মস্তিস্কের জট খুলতে শুরু করেছে। তিনি দম নিচ্ছেন। এর মধ্যে তার বোন বলে উঠল, 'কী করবে, মেরে ফেলবে? আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মে শান্তি খুঁজে পেয়েছি।'

উমর এবার কোনো জবাব দিলেন না। ঘরের পরিবেশ হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেছে। বোনের রক্তাক্ত চেহারা দেখে তার মায়া হলো। তাকে এখন আহত সিংহীর মতো লাগছে। তবুও এক অপার্থিব পবিত্রতা তার চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছে। এতদিন ইসলাম গ্রহণ করায় অনেকের ওপর তিনি অত্যাচার করেছেন। এখন কি তাহলে তার নিজের বোন ও ভগ্নিপতিকেও নির্যাতনের শিকার হতে হবে? এ চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তুলল। ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। উমরের অন্তর গলতে শুরু করেছে। তিনি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন।

উমর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও তো। আমি একটু পড়ে দেখি মুহাম্মাদ কী বাণী প্রচার করে?'

এ কথায় তারা খুব অবাক হন। তাকে কুরআনের মুসহাফটি দেওয়া ঠিক হবে কি হবে না, এ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। উমর হয়তো সেটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে, কুরআনের অবমাননা করবে এবং রাসূল সম্পর্কে মন্দ কথা বলবে। এ জন্য ফাতিমা বললেন, 'আমাদের আশঙ্কা হয়, বইটি দিলে তুমি নষ্ট করে ফেলবে।'

উমর তাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, আমি সেটি অক্ষত অবস্থায় আবার ফেরত দেব।'

সম্ভবত উমর হেদায়েতের পথে চলতে শুরু করেছেন—এ কথা ভেবেই ফাতিমা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। তিনি সম্মানের সঙ্গে বললেন, 'হে আমার ভাই, আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র। অথচ এই বই স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন।' তারপর ফাতিমা তাকে গোসল করে আসতে বললেন। অবিশ্বাস্য! উমর এ নির্দেশ মেনে নিলেন। এই ঘরে কিছুক্ষণ আগে যে গুমোট অন্ধকার ছিল, তা কেটে গিয়ে জান্নাতী আভায় দীপ্তমান হয়ে উঠল। তাদের চোখেমুখে আনন্দের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। নতুন উমরের জন্ম হতে আর বেশি বাকি নেই!

এরপর ফাতিমা উমরকে ওই পৃষ্ঠাগুলো দিলেন যেখানে সূরা ত্বহা লিপিবদ্ধ ছিল এবং তিনি পড়তে শুরু করলেন। একপর্যায়ে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না এবং বললেন, 'কি সুন্দর কথা! কি মহান বাণী!'

উমরের পড়া শুনে আত্মগোপনে থেকে খাব্বাব আনন্দিত হয়ে উঠলেন। এখন আর লুকিয়ে থাকার মানে হয় না। তিনি বের হয়ে এলেন। সরাসরি উমরের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে উমর, আমার মনে হয়, আল্লাহ তার নবীর দুআ কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দুআ করছিলেন—'হে আল্লাহ, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা উমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।' সুতরাং হে উমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।'

হঠাৎ খাব্বাবকে দেখে উমর অবাক হলেন। ঘরে যে তৃতীয় আরেকজন আছে, এটি তিনি চিন্তাও করেননি। খাব্বাব এখানে কী করছে? এতক্ষণই বা কোথায় ছিল? এ চিন্তা করার সময় নেই। তিনি তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। খাব্বারের মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে তার কঠিন হৃদয় আরও বিগলিত হয়েছে। তিনি যাকে হত্যা করতে চেয়েছেন, তিনিই কিনা গোপনে তার জন্য দুআ করেছেন! উমর আর সময় নষ্ট করতে চান না। তিনি খাব্বাবকে বললেন, 'হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি এখনই তার নিকট যেতে চাই।'

খাব্বাব বললেন, 'তিনি সাফা পর্বতের নিকট একটা বাড়িতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে অবস্থান করছেন।'

তারপর ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকল। উমরের গন্তব্য আগেও যা ছিল, এখনো তা-ই। তবে বিস্ময়কর সত্য হচ্ছে, এখন উদ্দেশ্য ভিন্ন। শীঘ্রই উমর দারে আরকামে পৌছে গেলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন।

দরজার ওপাশে উমরকে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন। তারা রাসূলের কাছে ছুটে গেলেন। হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এসে বললেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাকে আসার অনুমতি দেন। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আমরা তাকে সহযোগিতা করব, আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না। দুআ কবুল হওয়াতে তার অন্তর গভীর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ভরে উঠল। তিনি বললেন, 'তাকে আসতে দাও।'

ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। বিশালদেহী উমর ভেতরে প্রবেশ করলেন। রক্তিম ফর্সা চেহারায় এখন অনেক বিনয়ের ছাপ। ঔদ্ধত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। সমর্পিত অন্তরে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু থাকে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার অন্তরেও গভীর ভালোবাসা উথলে উঠেছে। তিনি উমরকে স্বাগত জানালেন। তারপর পরম মমতায় তাকে বুকে টেনে নিলেন। আহ! কী অপূর্ব দৃশ্য! গুটিকয়েক সাহাবী দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। জান্নাতী আভায় ছেয়ে গেছে পুরো পরিবেশ। তারা সবাই-ই তো জান্নাতী! উমরও এখন সেই কাফেলায় যুক্ত হতে যাচ্ছেন।

সবকিছুরই ভূমিকা থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই পর্ব শুরু করলেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? আল্লাহর কসম! আল্লাহর তরফ থেকে তোমার ওপর কোনো কঠিন মুসিবত না আসা পর্যন্ত তুমি সংযত হবে বলে আমার মনে হয় না।'

উমর বিনীতভাবে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহ, তার রাসূল ও আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনার জন্যই এসেছি।'

আর তখনই দারুল আরকামে এক অবিশ্বাস্য পরিবেশের সৃষ্টি হলো। গতরাতে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দুআর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ওই সকল সাহাবায়ে কেরামসহ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজেদের সংবরণ করতে সক্ষম হলেন না এবং তারা সবাই একত্রে তাকবীর দিয়ে উঠলেন। এ তাকবীরে পুরো মক্কা যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। সারারাত এ কম্পন আর থামেনি।[২]

---

[২] উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু (৫৮৪-৬৪৪ খ্রি.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা এবং প্রধান সাহাবীদের অন্যতম। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর তিনি দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী আইনের একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ছিলেন। ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করার কারণে তাকে আল-ফারুক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেওয়া হয়। 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধিটি সর্বপ্রথম তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তার শাসনামলে খেলাফতের সীমানা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এসময় সাসানীয় সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। তার শাসনামলেই জেরুজালেম মুসলিমদের হস্তগত হয়। এছাড়াও তার মেয়ে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোনো পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলে।' (*সহীহ*, মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৮৫)
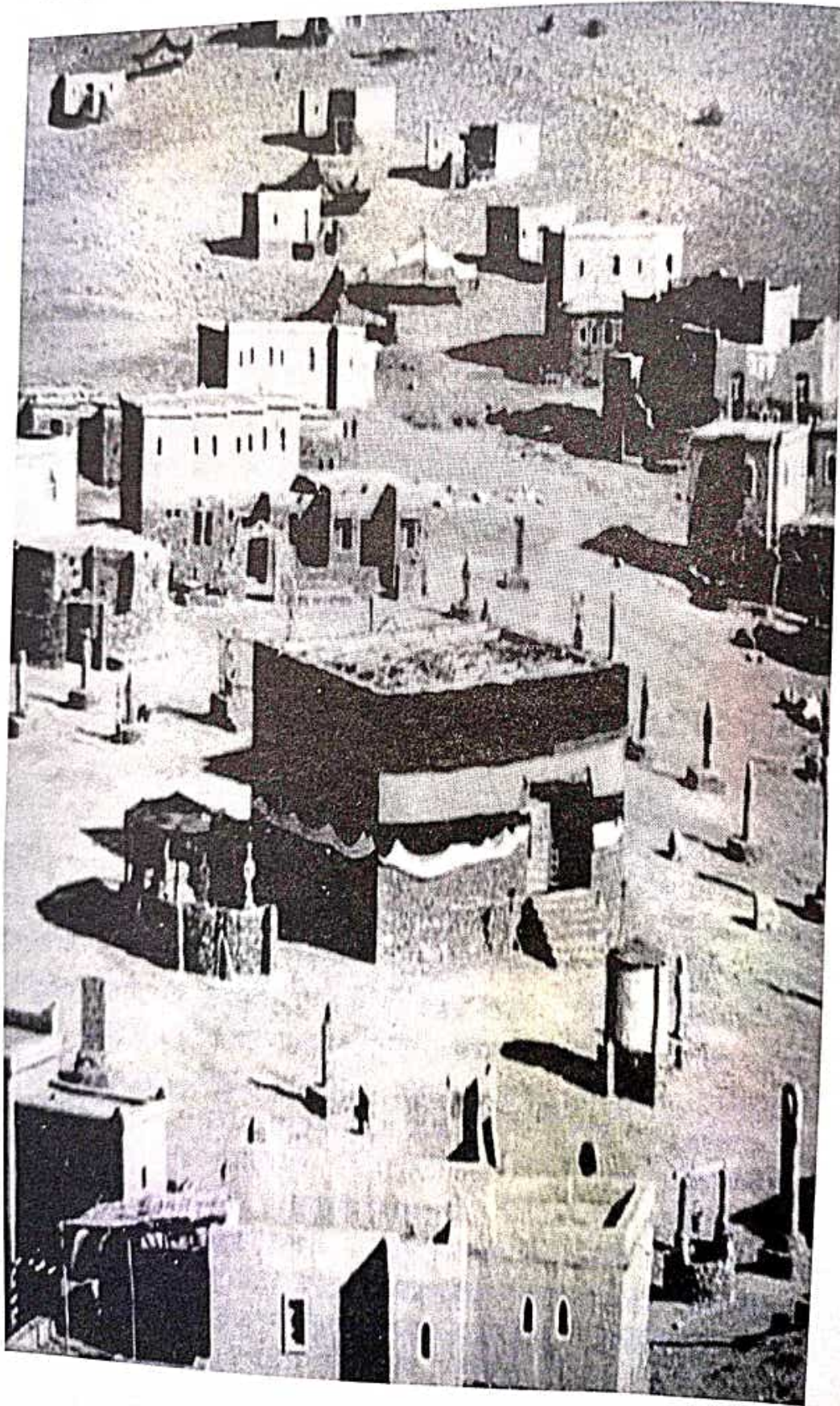
আবু যর গিফারি রা.-এর ইসলামগ্রহণ

অদ্দান উপত্যকা। গিফার গোত্রের বাসভূমি। রাতে সাধারণত এ গোত্রের লোকজন ঘুমায় না। তারা শিকারের সন্ধানে থাকে। মানুষ শিকার। পথে কাউকে একা পেলেই তার সর্বস্ব কেড়ে নেয়। মেরে ফেলতেও দ্বিধা করে না। ডাকাতের দল এরা। লুণ্ঠনই জীবিকার অবলম্বন। কত বণিক দল যে তাদের হাতে নিঃস্ব হয়েছে, হিসেব রাখে না কেউ। অবশ্য সব বণিকদলের ওপর এরা আক্রমণ করে না। মক্কার কুরাইশরাও এ পথে সিরিয়া যায়। তাদের কাছ থেকে ভালো চাঁদা পায় বলে কিছু বলে না। চাঁদা দিতে না চাইলেই লুটতরাজ চলে। তাদের ভয় করে সবাই। এসব ভয়ানক মানুষের ভিড়ে একজন কেবল ব্যতিক্রম। ডাকাতির বাইরে নতুন এক চিন্তায় তার মন অস্থির হয়ে আছে।

মানুষটির নাম জুন্দুব (আবু যর)। দুর্ধর্ষ ডাকাত। দুর্দান্ত সাহসী। সাহস না থাকলে ডাকাতি করা যায় না। তবে তার সাহসের সবাই প্রশংসা করে। গোত্রে নাম-ডাক ছড়িয়েছে। এমনিতে গোত্রের লোকেরা মূর্তিপূজা করে। অনেক খোদা মানে। এগুলো তার মনে ধরেনি কখনো। ডাকাতরা ধর্মের চিন্তা করে না। জুন্দুব চিন্তা করেন। তার মন বলে—খোদা কেবল একজনই। এত খোদা থাকতে পারে না। গভীর

অন্ধকারেও তার মন আলোর সন্ধান করেছে। এভাবে কতকাল গিয়েছে, কে জানে। এখন তিনি শুনতে পেলেন, মক্কায় এক নতুন নবীর আগমন ঘটেছে। তিনি নতুন ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন। এক স্রষ্টার দিকে আহ্বান করছেন। এই নতুন নবী সম্পর্কে জানা দরকার। ধর্মটাই বা কী? তার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।

জুন্দুব সর্দার মানুষ। অনেক দায়িত্ব। এগুলো ফেলে কোথাও যাওয়া মুশকিল। নতুন নবী সম্পর্কে জানতে হলে মক্কায় যেতে হবে। পথ অনেক। হুট করে যাওয়াও যাচ্ছে না। ফিরে আসতে সময় লাগবে। অনেক ভেবে নিজের ভাইকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তার ভাইয়ের নাম আনিস। আনিসকে বুঝিয়ে বললেন সব। নতুন নবীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে আসতে হবে। আনিস গেল।

এবার জুন্দুবের অপেক্ষা করার পালা। মাত্র ক'টা দিন। সময় যেন কাটছেই না। এক অপার্থিব অস্থিরতা তাকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ আনিস ফিরে আসার খবর এলো। জুন্দুব দৌড়ে গেলেন। এক শ্বাসে অনেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। আনিস বলতে লাগল : 'আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি তোমার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নতুন ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তবে লোকজন তাকে *সাবি* (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলে। লোকজন তাকে কী নামে সম্বোধন করছে, আমি কেবল তা-ই বলছি। কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি; কিন্তু আমি তার কথা নিজ কানে শুনেছি, আমি নিশ্চিত—তিনি এসবের কিছুই নন। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যই বলছেন।'

আনিসের কথায় জুন্দুবের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। নিজেকে সামলানোই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এখনই সেই মানুষটির কাছে যাওয়া প্রয়োজন। তাকে স্বচক্ষে না দেখলে তৃপ্তি মিটবে না। সব ছেড়ে গেলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব কে নেবে? এ দায়িত্ব কাউকে দেওয়া দরকার। আনিসকে বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। শুধু বলল, মক্কার লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

জুন্দুবের মনে এখন আনন্দের ঢেউ। মনে হয়, বহুকাল পরে কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হবে। তিনি দ্রুত প্রস্তুতি নিলেন। সঙ্গে কিছু খাবার ও এক মশক পানি নিলেন। তারপর রওনা হয়ে গেলেন। মরুর পথে একাকী—মক্কার দিকে, প্রিয়জনের সাক্ষাতে।

মরুভূমির কঠিন পথ। মাথার ওপর সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়েই তিনি হাঁটছেন। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারেও তার পথ চলা থামেনি। তিনি মক্কায় এসে পৌঁছলেন। এ শহরের অলি-গলি তার অপরিচিত। নতুন নবী কোথায় থাকেন, তিনি দেখতেই বা কেমন—এসব তার জানা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন। এ শহরে তার পরিচিত কেউ নেই। নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতায় এরা অভ্যস্ত। সম্ভবত এরা গিফারীদেরও ছাড়িয়ে যাবে। শহরে ঢুকতেই একজনের দেখা মিলল। আবু যরের দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। তাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, 'তোমরা যাকে সাবি বলো, সেই লোকটি কোথায়?'

লোকটি এ প্রশ্নে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে এমন করে আবু যরের দিকে তাকায়, যেন এখনই মাথায় তুলে আছাড় দেবে। আবু যর ভয়ই পেয়ে যান। এ ভয় কাপুরুষতার নয়, এটি এত কাছে এসেও না পাবার ভয়। তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে

হবে। এজন্য কথা না বাড়িয়ে আবার হাঁটা শুরু করেন। কাবা-চত্বরে গেলে নিশ্চয়ই কিছু জানা যাবে। সব গোত্রের লোকই সেখানে যায়। নতুন নবীও হয়তো আসবেন।

কাবা-চত্বরে এসেও কিছু জানা যাচ্ছে না। কারও সঙ্গে কথা-ই বলা যাচ্ছে না। সবাই কেমন জানি নির্লিপ্ত। দ্বিধায় জর্জরিত। সাবিদের মধ্যে কারও খবর মিলছে না। পথের ক্লান্তিতে বিষণ্ন হয়ে উঠছে তার মন। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। দেহকে আর সোজা রাখা যাচ্ছে না। তিনি সটান হয়ে চত্বরের এক পাশে শুয়ে পড়লেন। জ্বলে ওঠা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ছে তার চেহারায়। এ চেহারা এ শহরের মানুষ কখনো দেখেনি!

আগন্তুকের চেহারা দেখে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থমকে দাঁড়ালেন। এ পথ দিয়েই তাকে বাড়ি যেতে হয়। পথে মুসাফির কাউকে পেলে সঙ্গে নেন। আজকের লোকটাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। সম্ভবত মক্কায় নতুন এসেছে। কাউকে চেনে না মনে হয়। চোখে-মুখে রাজ্যের অনিশ্চয়তা। পেটানো শরীর হলেও কেমন নুইয়ে পড়েছে। তিনি তাকে ডাকলেন। নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

মক্কায় এক কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেছেন। তিনি সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছেন। তারপর থেকেই মক্কার মুশরিকরা বেঁকে বসেছে। তাদের এতদিনের 'আল-আমীন' এখন শত্রু হয়ে গেছে। কেউ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ভিড়লে তার আর রক্ষা নেই। এ পর্যন্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন তার ওপর ঈমান এনেছে। প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়নি এখনো। শহরের বিভিন্ন স্থানে মক্কার

মুশরিকরা ঘোরাফেরা করছে। বাইরের লোকদের মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে তারা তাদের সেখানে যেতে বারণ করে। তারপর না শুনলে শাস্তি দেয়। এজন্য নতুন নবীর কথা জানলেও কেউ মুখ ফুটে বলে না। কাউকে দাওয়াত দিতেও ভয় ভয় লাগে। নেতাদের বলে দিলে সর্বনাশ!

জুন্দুব নীরবে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অনুসরণ করলেন। নতুন নবীর প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করবেন কি না, বুঝতে পারছেন না। কে জানে লোকটা কেমন! লোকটার বয়স কম। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। আচরণও ভালো মনে হচ্ছে। তবুও ভয় লাগে। নেতাদের কেউ হলে নিশ্চয়ই তাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে। মেরেও ফেলতে পারে। মৃত্যুকে তিনি ভয় পাচ্ছেন না। তবে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা না করে মরতেও চাচ্ছেন না। এদিকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও ভয় পাচ্ছেন—দ্বীনের কথা বললে যদি সে গ্রহণ না করে!

শেষ পর্যন্ত কেউই এ বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। তাদের মনের কথা অব্যক্তই রয়ে গেল। মনের কথা আটকে রাখা সহজ নয়; কষ্টের। পরিবেশ কতটা মারাত্মক হলে অন্তরে এতটা ভয় কাজ করে! রাতের অন্ধকারের নির্জনতায়ও সে ভয় কাটছে না। পরদিন সকালে আবার যে যার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

জুন্দবের পথ কাবা-চত্বরেই থেমে আছে। আজ দুই দিন হয়ে গেল। তিনি যার সন্ধানে এসেছেন, তার সম্পর্কে এখনো কিছুই জানতে পারেননি। জানার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। আজ রাতেও নিশ্চয় ওই লোকটা এসে তাকে নিয়ে যাবে।

ঘুমাবে। পরদিন আবার এখানে এসে বসে থাকবে। হলোও তাই। এভাবে তৃতীয় রাত ঘনিয়ে এলো।

সম্ভবত আর দেরি করা যায় না। মুসাফিরের উদ্দেশ্য জানা দরকার। কতদিন এভাবে কাটবে? তিনদিন তো হয়ে গেল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুই ঝুঁকি নিলেন। তারই হক বেশি জানার। সাহস সঞ্চয় করে মুসাফিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি মক্কায় কেন এসেছেন?'

সময় এসেছে মনের কথা বলার। এখন আর সংকোচ করে লাভ নেই। যা-ই ঘটুক, বলারই সিদ্ধান্ত নিলেন জুন্দুব। আগে একটু ভূমিকা করে বললেন, 'আপনি যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন, আমি যা চাই সেদিকে আমাকে পথ দেখাবেন—তাহলে আমি বলতে পারি।'

জুন্দুবের কথা শেষ হতেই আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সায় দিলেন। তখন জুন্দুব বললেন, 'আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি—নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তিনি যেসব কথা বলেন তার কিছু শুনতে।'

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। এমন মানুষই তো তিনি খুঁজছেন। এবার দুজনের কথার খই ফুটতে লাগল। নবীর পরিচয় দিতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'তিনি প্রকৃতই একজন সত্য নবী,' এই বলে আলী আলোচনা শুরু করলেন। জুন্দুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। যে চায়, সে পায়। এই প্রাপ্তিতে জুন্দুব উচ্ছ্বসিত। এখনো প্রিয়জনের দেখা বাকি!

সকালেই দুজন নবীর সাক্ষাতে রওনা হলো। মক্কা থেকে রাসূলের নিবাস বেশি দূরে নয়। তবুও এই পথটুকুতে দুজনের জন্য একসঙ্গে চলা কঠিন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সবাই চেনে। জুন্দুবকে কেউ চেনে না। তাকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখলে মুশরিকদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠবে। এজন্য সতর্কতা প্রয়োজন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আগে আগে হাঁটব। আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি কোনো বিপদের আশঙ্কা করি, তাহলে প্রস্রাবের ভান করে রাস্তার এক পাশে সরে যাব। আপনি আপনার পথে চলতে থাকবেন। চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে ঠিকই খুঁজে নেব। আর আমি যদি কোনো বিপদের আশঙ্কা না করি, তাহলে আপনি আমার সঙ্গেই পথ চলবেন এবং আমরা যেখানে যেতে চাই, সেখানে গিয়ে মিলিত হব।'

শীঘ্রই তারা একটি ঘরের নিকট এসে দাঁড়ালেন। কেউ একজন তাদের জন্য দরজা খুলে দিল। জুন্দুব ঘরে প্রবেশ করেই এমন এক উদ্ভাসিত চেহারা দেখলেন, যেন পূর্ণিমার চাঁদ, যার আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে দৃষ্টি দিতেই তার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে গেল।

জুন্দুব বলে উঠলেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তার কথায় মনে হয়, জুন্দুব ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তারপর তিনি নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। নিজের পেশা ও মক্কায় আসার কারণ বর্ণনা করে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এখন কী করতে হবে? আপনি মানুষকে কোন ধর্মের দিকে আহ্বান করেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আমি তোমাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান করছি। তার সঙ্গে অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না। আর মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে হবে।' আবু যর তখনই উচ্চারণ করলেন : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি এটিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি তার রাসূল।'

আর এভাবেই জুন্দুব ইবনে জুনাদাহ (আবু যর) রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

---

[৩] আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তার জীবন অতিবাহিত করেছেন দুনিয়াবিমুখ হয়ে—কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে। একদিন যে লোকটি অদ্দান উপত্যকায় আতঙ্ক আর ত্রাসের নাম ছিল, সে ব্যক্তিই ইসলামগ্রহণের পর থেকে নির্লোভ আর দুনিয়াবিমুখতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল, সকলেই তার মতো ধন-দৌলতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। তার মতে আগামীকালের জন্য কোনো সম্পদই আজ সঞ্চয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করাকেই প্রাধান্য দিতেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আকাশের নীচে এবং পৃথিবীর উপর আবু যরের চেয়ে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী আর কেউ নেই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে, তার মৃত্যুর পর যখনই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মনে করতেন, তখনই অঝোর ধারায় কাঁদতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'আল্লাহ আবু যরের ওপর রহম করুন। সে একাকী চলে, একাকীই মরবে, কিয়ামতের দিন একাই উঠবে। (*আস-সিরাহ আন-নবুওয়াহ*, ইবনে হাশিম, ৪/১৭৮; *আল-হাকিম*, ৩/৫০)। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মদীনা থেকে বহুদূরে নির্জন মরুভূমিতে 'রাবজা' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

হামযা রা.-এর ইসলামগ্রহণ

মক্কার দিনকালের এখন ঠিক নেই। প্রতিদিন কোনো-না-কোনো অঘটন ঘটছেই। কুরাইশদের একের পর এক চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। তারা ইসলামকে ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পারছে না। পারার কথাও নয়—এটি তারা শুনেছে; তবে বিশ্বাস করে না। একদিন পুরো শহরই ইসলামের পতাকাতলে শামিল হবে। সেদিন কবে হবে—আপাতত তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ইতোমধ্যে নবুওয়াতের দুই বছর চলে গেছে। মক্কায় আবার হজের মৌসুম শুরু হয়েছে। হজের মৌসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সচকিত হয়ে ওঠেন। ভিন দেশের মানুষের কাছে ইসলামকে তুলে ধরেন। বেশিরভাগ মানুষই সম্পদ ও নেতৃত্ব হারানোর ভয় করে। এজন্য এ পথে আর এগুতে চায় না। একদিন তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছেন। এ সময় আবু জাহেল এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ। চারদিকের কত শব্দই তো কানে আসে। সব শব্দে মানুষ বিচলিত হয় না। কিন্তু গালিগালাজের শব্দ মানুষ সহ্য করতে পারে না। ক্ষেপে যায়। রাসূল ক্ষেপছেন না। তিনি নির্বিকার। জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করছেন না।

আবু জাহেল স্পষ্টতই ব্যর্থ হলো। একাই রাগে গড়গড় করতে করতে কাবা-চত্বরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে তার কুরাইশ বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছে। আবু জাহেল সেই আড্ডায় গিয়ে বসে দম নিল। ঘটনাটা এখানেই শেষ হলো না। গড়াল আরও অনেকদূর! মক্কার মুশরিকরা এ ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদানের ক্রীতদাস কাবা-চত্বরেই ছিল। একটু দূর থেকে পুরো ঘটনাই সে প্রত্যক্ষ করে। ঘটনাটা কাউকে জানানো দরকার। খামাখা একজন মানুষকে এভাবে গালি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এর একটা বিহিত হওয়া উচিত। যুলুমের মুখে নিশ্চুপ থাকাও একটি যুলুম। দাস মানুষ। নিজের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। নেতৃস্থানীয় কাউকে বিষয়টা বলা দরকার। তেমন কাউকে এখন দেখা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া এই মুহূর্তে তার আর কিছু করার নেই।

হামযা—কুরাইশদের অহংকারের প্রতীক। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। তার শরীর পেশিবহুল এবং শক্তিশালী। কুরাইশদের প্রত্যেকে তাকে ভয় পায়। তার সাহসিকতার জন্য সবাই তাকে সমীহ করে চলে এবং সব সময় তার পক্ষেই থাকার চেষ্টা করে। তিনি তার ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই বছরের বড় এবং দুধভাইও। তার মা রাসূলের আত্মীয়—চাচাতো বোন।

হামযা শিকার করতেন। শিকার করা তার কাছে ইবাদতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য অনেক প্রস্তুতি নিতেন, সাজ-সজ্জা তো ছিলই। ঘটনার দিন তিনি শিকার থেকে ফিরছিলেন। তার দু-হাতে তির-ধনুক ধরা ছিল। ফেরার পথে সবাইকে শিকারী যন্ত্রপাতি দিয়ে অভিবাদন জানানো ছিল তার সাধারণ

নিয়ম। তারপর কাবা-চত্বরে গিয়ে শিকার সমাপ্ত করতেন। অভ্যাস অনুযায়ী ওই দিন শিকার থেকে ফেরার পথে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন, তাদের খোঁজখবর নিলেন। তারপরই আব্দুল্লাহ ইবনে জুদানের ক্রীতদাসের সঙ্গে তার দেখা হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুদানের ক্রীতদাস তাকে দেখে খুশি হলো। সকালের ঘটনাটা বলার মতো লোক পাওয়া গেছে। সে বলল : আবু আম্মারা, আপনি কি জানেন আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদ এবং আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জাহেল)-এর মধ্যে কী ঘটেছে? ওই তো ওইখানে—সে মুহাম্মাদকে দেখে তার নিকট এগিয়ে যায়। তারপর খুব বাজে ভাষায় তাকে গালমন্দ করেছে এবং অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে এমনকি তাকে উসকে দিতে চেয়েছে যেন একটি মারামারি বাধিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ তার দিকে ফিরেও তাকাননি। কোনো জবাবও দেননি।'

এ ঘটনা শুনে হামযা ভীষণ ক্ষেপে যান; তার শিরা-উপশিরায় আগুন ধরে যায়। ইসলাম গ্রহণ না করলেও ভাতিজার প্রতি ছিল প্রাণের টান; তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের আচরণ কখনো তার ভালো লাগেনি। যদিও এতদিন এর কোনো প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু আজ আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। আবু জাহেলের জঘন্য কর্মকাণ্ড তাকে অস্থির করে তুলল। এখনই এর জবাব দিতে হবে। তিনি দ্রুত রওনা হয়ে গেলেন!

শরীরে শিকারের পোশাক। কাঁধে ঝুলছে তির-ধনুক। এগুলো নিয়েই তিনি হাঁটছেন। এখনো শিকারেই যাচ্ছেন। তবে এবার লক্ষ্য কোনো বন্যপ্রাণী নয়; কাবা-চত্বরে আড্ডায় বসে থাকা

আবু জাহেল। পথে কারও প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ নেই। কেউ সাহসও করছে না কিছু বলার। সবাই যেন তাকে অনুসরণ করছে। কী ঘটে, তা-ই দেখার আগ্রহ তাদের। কাবা-চত্বরে আবু জাহেলকে খুঁজে পেতে দেরি হলো না। আসলেই সে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সে জানে না, তার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। আবু জাহেলকে দেখেই হামযা তার দিকে তেড়ে গেলেন।

হামযার দিকে ভয়ার্ত চোখ দেখে আবু জাহেল ভড়কে গেল। ভড়কে গেল তার সঙ্গীরাও। এই মানুষটিকে সমীহ করে না, মক্কায় এমন কেউ বেঁচে নেই। আবু জাহেল ঘটনা বুঝতে পেরে আগেই কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল। কাজ হলো না। শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকা যায়। অপরাধ করে মাফ পাওয়া যায় না। হামযা তার ধনুক দিয়ে আবু জাহেলের মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। এতে তার মাথা কেটে গেল। এবার তার বুক বরাবর তির নিশানা করে গর্জে উঠলেন : 'কোন সাহসে তুমি তাকে আক্রমণ করলে? কোন সাহসে তুমি তাকে গালমন্দ করেছ? তাহলে জেনে রাখো, আমিও তার দ্বীন কবুল করলাম; সে যা বলে আজ থেকে আমিও তা-ই বলব। ক্ষমতা থাকলে আমার সামনে দাঁড়াও!'
ঘটনার আকস্মিকতায় আবু জাহেল দিশেহারা হয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে বনু মাখযুমের কিছু লোক আবু জাহেলের সাহায্যে ছুটে এল। আবু জাহেল তাদের বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমরা আবু আম্মারকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! কিছুক্ষণ আগেই আমি তার ভাতিজাকে মারাত্মক গালি দিয়েছি।'

লোকেরা হামযাকে উসকে দিতে বলল, 'হামযা, সম্ভবত তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছ!'

হামযা দ্রুত এর জবাব দিলেন : 'যখন তার সত্যতা আমার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন তা থেকে আমাকে বিরত রাখবে কে? হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যা কিছু তিনি বলেন, সবই সত্য। আল্লাহর কসম! আমি তা থেকে আর ফিরে আসতে পারি না। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখো!'

হামযার সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত এবং তিনি সেখান থেকে সরাসরি তার ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানেই গিয়েই তিনি তার ঈমানের ঘোষণা দিলেন। যে দিনের সূচনা হয়েছিল একটি অনভিপ্রেত ঘটনার মধ্য দিয়ে, সেই একইদিনের সমাপ্তি হলো হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহসী বীরের ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে। সেই দিন চিরদিনের জন্য ভাস্কর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।[৪]

---

[৪] হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনুহ বদর-যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। এ যুদ্ধের শুরুতে মক্কার মুশরিকরা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানায়। এতে যে তিনজন মুহাজির সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে যেতে বলেন, তিনি তাদের একজন। এরপর উহুদ-যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। কাফেররা তার লাশ বিকৃত করে ফেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্মানিত চাচার লাশ দেখে কেঁদে ওঠেন। তাকে সাইয়্যিদুশ শুহাদা (সকল শহীদদের নেতা), আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) এবং আসাদ আল-জান্নাহ (জান্নাতের সিংহ) বলে সম্বোধন করা হয়।

athar javed

সাদ ইবনে মুআয রা. এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর রা.
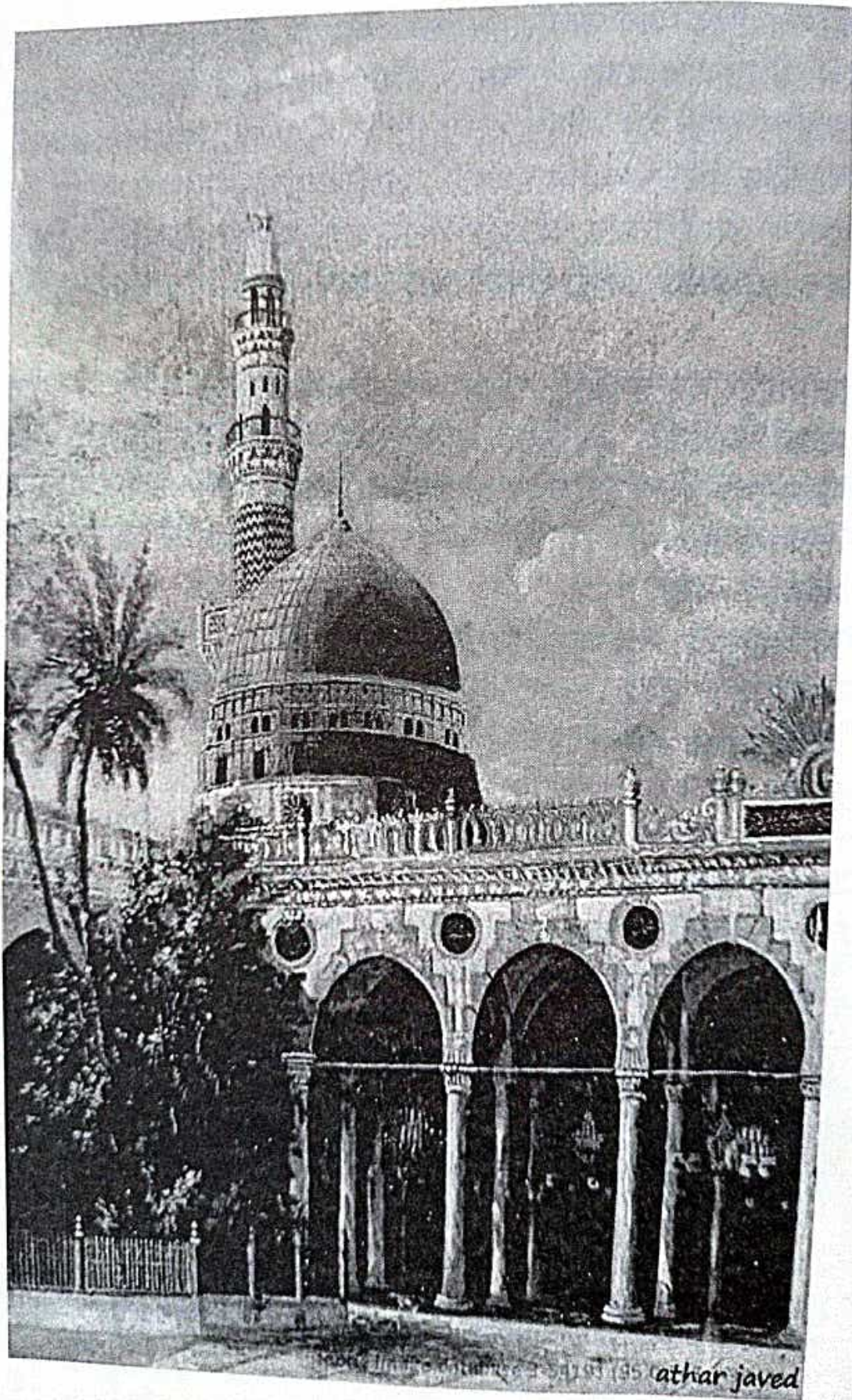
মদীনায় নতুন একজন মানুষ এসে বসতি গেড়েছেন। তিনি এসেই যেন মদীনায় ঝড় তুলেছেন। এ ঝড়ে আকাশ প্রকম্পিত হয় না। মানুষের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সব ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়ে তোলে। তিনি হলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম প্রতিনিধি। ঠিক যেন রাসূলেরই প্রতিচ্ছবি! তার আভিজাত্য ও গঠন, চরিত্র ও কথোপকথন এবং অপার্থিব আচার-আচরণে মুগ্ধ হয় না, এমন মানুষ বিরল। মানুষ তাকে আশ্চর্য প্রদীপ মনে করে। কাছে এলে আর দূরে সরে যেতে পারে না। তিনি যা-ই বলেন, তা-ই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। এতে তারা শত বছরের পুরোনো অন্ধ বিশ্বাস ও লৌকিকতা বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করছে না। তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে। মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুই একমাত্র সাহাবী—যিনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত গড়তে একাই লড়েছেন, জীবন বাজি রেখেছেন এবং আল্লাহর সাহায্যে তার মিশন সম্পন্ন করেছেন।

তখন মদীনার পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল বেশ জটিল। খ্রিস্টান, ইহুদী আর পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী গোত্ররা পাশাপাশি অবস্থান করত। এ অবস্থান সহজ ছিল না। প্রায়ই গোত্রে গোত্রে

মারামারি লেগে যেত। তুচ্ছ বিষয় নিয়েই খুনাখুনি হতো। আর তা থামতও না। একবার কেউ শত্রু হয়ে গেলে বংশপরম্পরায় শত্রুতা চলত। তবে সবচেয়ে খারাপ ছিল ইহুদীরা। সর্বশেষ নবীর আগমনের নিশ্চিত তথ্য জানার পরও অবিশ্বাস আর শত্রুতা ছিল তাদের স্বভাবজাত। এই কঠিন পরিস্থিতিতেই মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

আউস ও খাজরায—মদীনার দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র। জাহেলী যুগে প্রসিদ্ধ হওয়া মানেই যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠিন জীবন। এ দুটি গোত্রও তা থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। পরস্পর শত্রুতা ও লড়াইয়ের জন্যই এরা মদীনায় ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। এদের নেতারাও আজন্ম যোদ্ধা। এরকম দুজন নেতা ছিলেন সাদ ইবনে মুআয এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর। তারা ছিলেন আউস গোত্রের। বনু আব্দুল আশহাল শাখাগোত্রে তাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।

মদীনায় ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমের পরিধি বাড়ছে। মুসআব বনী জাফার গোত্রে বসে মানুষকে কুরআনের তালীম দিতেন। একদিন আসআদ ইবনে জুরারা মুসআবকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার উদ্দেশ্যে বের হলেন। ওই এলাকা ছিল বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের বসতি। তারা একটি কূপের নিকট এসে যাত্রাবিরতি করেন।

সাদ ইবনে মুআয এবং উসাইদ ইবনে খুদাইর এই সংবাদ পেলেন। তারা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এর আগেও তারা মুসআবের সংবাদ পেয়েছেন। সে এসে এদেশে নতুন ধর্ম প্রচার করছে। এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। এখন একদম তাদের নাকের ডগায় চলে এসেছে। এর একটা বিহিত করা

দরকার। এ দুজনকেই দেশ ছাড়া করতে হবে। সাদ ইবনে মুআযের রাগই বেশি। তিনি নিজেই যেতে চাইলেন। মুশকিল হচ্ছে, আসআদ ইবনে জুরারা হলো তার খালাতো ভাই। এজন্য তিনি উসাইদকে বললেন, 'তোমার পিতার সর্বনাশ হোক! তুমি এখনই এ দুজন লোকের কাছে যাও। তারা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে আমাদের বাড়ির ওপর চড়াও হয়েছে। তাদের তাড়িয়ে দাও; এ পথ মাড়াতে নিষেধ করো। যদি ওই লোকটির সঙ্গে আসআদ ইবনে যুরারা না থাকত, তাহলে আমি নিজেই যেতাম। তার সামনে আমার যাওয়া ঠিক হবে না।'

উসাইদ ইবনে হুদাইর সাদের কথায় রাজি হলেন। হাতে বর্শা তুলে নিলেন। তারপর একাই ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য ছুটলেন। চেহারায় মারাত্মক গোস্বা। মেজাজও তেঁতে আছে। দ্রুত হাঁটছেন। তার হাঁটার ভঙ্গিতে গোস্বা যেন বেড়েই চলছে।

আসআদ তাকে দূর থেকে আসতে দেখেলেন। তিনি ঘাবড়ালেন না। এরকম ভয় জয় করে তারা ইতোমধ্যে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছেন। তিনি মুসআবকে বললেন, 'দেখুন, একজন লোক আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। সে তার গোত্রের সর্দার। আপনি তাকে মুসলিম বানিয়ে দেন।'

উসাইদ শুরু থেকেই উত্তেজিত। তিনি অত্যন্ত গরম মেজাজে বললেন, 'তুমি কেন এখানে এসেছ এবং দুর্বলদের নিকট এসব কী প্রচার করছ? যদি জানে বাঁচতে চাও, এখনই এ দেশ ছেড়ে চলে যাও।'

এরকম উস্কানীমূলক কথায় শান্ত থাকা যায় না। কেউ গরম হয়ে কথা বললে তার জবাবও গরম হয়ে দিতে হয়। দুনিয়ার

মানুষ এভাবেই অভ্যস্ত। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তো আসমানী মানুষ। তিনি পুরোপুরিই ব্যতিক্রম। তার অন্তর থেকে জাগতিক ভয়-ভীতি বহু আগেই বিদায় নিয়েছে। তিনি তার স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি কি একটু বসবেন এবং আমার কথা শুনবেন! যদি আপনার ভালো লাগে, তাহলে তা গ্রহণ করবেন নতুবা আপনি যা বলেন, আমরা তা-ই করব।'

মুসআবের কথা শুনে উসাইদ হঠাৎ করেই রাগ করার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। যুদ্ধবাজ গোত্রের নেতা হলেও তার বিবেকবোধ প্রখর ছিল। তিনি নমনীয় হতে বাধ্য হলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো বড় বুদ্ধিমত্তা ও ইনসাফের কথা।' এ কথা বলেই তিনি বর্শা পাশে রেখে বসে পড়েন।

এবার মুসআব তার কথা শুরু করলেন। তার কণ্ঠ থেকে ইসলামের মর্মকথা উচ্চারিত হচ্ছে। এ যেন মিষ্টিমধুর ঝর্ণাধারা! উসাইদ দারুণভাবে মুগ্ধ হন। নিজের ভেতর আবেগ যেন উথলে উঠছে। সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করাই তার জন্য মুশকিল হয়ে উঠেছে। মুসআবের কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, 'এ বিষয়টি কতই না চমৎকার...কি অপূর্ব কথা...'। তারপর তিনি বললেন, 'কেউ যদি এই দ্বীন গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তার কী করা উচিত?'

মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'প্রথমে গোসল ও পাক-সাফ কাপড় পরে কালিমা উচ্চারণ করতে হবে। তারপর সালাত আদায় করতে হবে।' এবারও মুসআবের কথা শেষ না হতেই উসাইদ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি যেন গায়েব হয়ে গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন। তার চুল থেকে টপ

টপ করে পানি ঝরছে। কারও আর বুঝাতে বাকি থাকল না, নাউসাইদ ইসলামে প্রবেশ করতে চলেছেন। শীঘ্রই তিনি মুসআবের হাতে হাত রেখে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন। এ এক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত! মুসলিম হয়েই তিনি মুসআবের প্রতি দরদী হয়ে উঠলেন। মুসআবের বিপদ এখনো কাটেনি। তিনি নিজে যে বিপদ ঘটাতে এসেছিলেন, সেই বিপদের আশঙ্কা এখনো শেষ হয়নি। তিনি মূলত সাদ ইবনে মাআযের কথাই ভাবছিলেন। এজন্য বললেন, 'আমি আরেকজনকে চিনি। যদি সে ঈমান আনে, তাহলে এই শহরে ঈমান আনার ক্ষেত্রে আর কেউ বাকি থাকবে না। একটু অপেক্ষা করুন। আমি তাকে আপনার নিকট পাঠাচ্ছি।'

ওই মজলিস থেকে উসাইদ সরাসরি সাদ ইবনে মুআযের নিকট গেলেন। সাদ মূলত তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে আরও বন্ধুরা ছিল। তারা উসাইদের আগমন দেখে ভিন্ন কিছু আঁচ করল। তাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা বলল, 'ওই তো সে আসছে। কিন্তু যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, তাতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এটি সেই একই উসাইদ নয়।'

সাদও কম বিচক্ষণ ছিলেন না। তিনি ঘটনা টের পেলেন। নিশ্চিতভাবেই উসাইদ কোনো সুরাহা না করেই ফিরে এসেছে। উসাইদ কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে এসেছ তুমি?'

উসাইদ নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করে এসেছেন, এ কথা বললে সাদ আরও

ক্ষেপে যাবে। মানুষ অকারণে রেগে গেলে সেখানে কারণ বর্ণনা করতে নেই। রাগ কমাতে হলে ভিন্ন কিছু করতে হয়। বড় কারও সান্নিধ্যে গেলে রাগ এমনিতেই দূর হয়ে যায়। তাকে এখন যেভাবেই হোক মুসআবের কাছে পাঠাতে হবে। এজন্য তিনি জবাবে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি ওই দুজনের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রথমে আমি তাদের ওই কাজে বারণ করেছি। তারপর তারা বলল, ঠিক আছে, আপনি যা ভালো মনে করেন, আমরা তা-ই করব।' আরও বললেন, 'আমি শুনেছি, বনী হারেসার লোকেরা আসআদ ইবনে যুরারাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তো ভালো করেই জানে সে তোমার খালাতো ভাই।'

এবার সাদ আরও রেগে গেলেন। তিনি গোত্রের সর্দার। তিনি এরকম বিশৃঙ্খল পরিবেশ কোনোভাবেই সায় দিতে পারেন না। একই সঙ্গে তিনি উসাইদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, তা সে করতে পারেনি। এখন তাকেই এর সুরাহা করতে যেতে হবে। তিনি বর্শা উঠিয়ে নিলেন এবং মুসআবের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তার চোখে-মুখ গোস্বায় ফেটে পড়ছে।

শীঘ্রই তিনি মুসআবরে নিকট হাজির হলেন। তিনি এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন যে, মুখে যা আসে তা-ই বলতে লাগলেন। প্রথমে তিনি তার চাচাতো ভাই আসআদের প্রতি তীব্র ভাষায় কথা বলা শুরু করলেন যে কিনা মুসআবকে এ শহরে নিয়ে এসেছে : 'আল্লাহর কসম, আমার আর তোমার মাঝে যে আত্মীয়তা তা যদি না থাকত, তবে তুমিও আজ রেহাই পেতে না।'

তারপর তিনি মুসআবকে লক্ষ করে তীব্র হুমকি দিতে থাকেন। জোরে জোরে তাকে গালমন্দ করেন। তার রাগ বাড়ছেই। মুসআব মুসআবেরই মতো। তার চেহারায় এর কোনো প্রভাবই দেখা গেল না। মৃত্যু—সে তো আসবেই। ভয়ে আগেই মৃত্যুবরণ করার মানুষ তিনি নন। বরং যারাই তাকে হত্যা করতে এসেছে, তারাই নতুন জীবন নিয়ে ফিরে গেছে। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'দয়া করে একটু বসুন। আমার বক্তব্য শুনুন! আপনার ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন নতুবা আপনার যা ইচ্ছা করবেন।'

হঠাৎ করেই পরিবেশ ভিন্ন মোড় নিতে শুরু করেছে। বিষয়টি এখন সাদের ইচ্ছাধীন। তাকে কোনো কাজে বাধ্য করার লোক এ পৃথিবীতে নেই। সুতরাং কিছু কথা শুনলে সমস্যা কী? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ন্যায্য কথা বলেছ।' উসাইদের মতো তিনিও তার বর্শা পাশে রেখে বসে পড়লেন এবং মুসআবের কথা শুনতে লাগলেন। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে মুসআব কথা শুরু করতেই সাদ হকচকিয়ে গেলেন। তার চেহারায় আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। মুসআব যা বলতে চেয়েছিলেন, তা শেষ করার আগেই তিনিও উসাইদের মতো বলে উঠলেন, 'কেউ যদি এই দ্বীন গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তার কী করা উচিত?'

মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু উসাইদকে যা বলেছিলেন, তাকেও একই কথা বললেন। এ দ্বীনের সবকিছুই পরিষ্কার এবং বাস্তব সত্য। যে কেউ তা গ্রহণ করবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিমান। এর বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো যুক্তি নেই। এখন আর পিছপা হওয়ার সুযোগ নেই অথবা এই দ্বীন থেকে

নিজেকে বিরত রাখারও কোনো মানে হয় না। মুসআবের সান্নিধ্যে এসে সাদও একই দায়িত্বপালনে সেই অলৌকিক চাবির সন্ধান পেয়েছেন—যা দিয়ে তিনি তারা গোত্রের অন্তরসমূহের বাধন খুলতে ব্যাকুল হয়ে গেলেন। তিনিও তার গোত্রের নিকট এমনভাবে ফিরে গেলেন—যাতে মুসআবের নিকট আসার সময়কার ক্ষিপ্রতার কোনো চিহ্ন ছিল না।[৫]

---

[৫] *মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা, পৃ. ১৮।

উমাইর ইবনে ওহাব রা.-এর ইসলামগ্রহণ

বদরযুদ্ধ শেষ হয়েছে বেশিদিন হয়নি। মক্কার মুশরিক বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। এমন পরাজয়ের কথা তারা কল্পনাও করেনি। এতে তাদের বড় বড় নেতা নিহত হয়েছে এবং অনেকেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে। তারা ফিরেছে একেবারে নিঃস্ব হয়ে। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এখন মক্কার ঘরে ঘরে শোকের মাতম চলছে। কেউ কেউ প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। শলা-পরামর্শ চলছেই।

উমাইর ইবনে ওহাব—কুরাইশদের মধ্যে জঘন্য প্রকৃতির দুষ্কৃতকারী নেতা। ইসলামের চরম দুশমন। সব নেতারই কিছু যোগ্যতা থাকে। উমাইরেরও ছিল। তার অনুমানশক্তি ছিল মারাত্মক প্রখর। তার দৃষ্টি যেন শ্যেণ দৃষ্টি। বিরাট কাফেলা দেখেই লোকসংখ্যা বলে দিতে পারত। এ অনুমান প্রায়ই সঠিক হতো। বদরেও মুশরিকরা তাকে কাজে লাগিয়েছে। মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ঠিক বললেও সেটি তাদের কোনো উপকার করেনি। সে বলেছিল, মুসলিমদের সংখ্যা তিনশর মতো হবে। এর কিছু কম বা বেশিও হতে পারে। কি আশ্চর্য অনুধাবন ক্ষমতা! এ ক্ষমতা দিয়ে সে এখনো নবীকে চিনতে পারেনি। এজন্য ঐশী অনুকম্পা লাগে। এর কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

উমাইরের ঘরে মন টিকছে না। অস্থির লাগছে। সকাল হতেই কাবা-চত্বরের দিকে গেল। তাওয়াফ করবে। তারপর দেবদেবিকে সাজদা করবে। মনে যদি একটু স্বস্তি আসে! কিছুতেই মন ভালো করা যাচ্ছে না। দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে আছে। সে ছেলের কথা ভাবছে। তার ছেলে ওহাব ইবনে উমাইর। এখন মুসলিমদের হাতে বন্দী। এ কষ্ট তার অন্তরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলছে। এখন কেবল মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পারলেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব।

কাবা-চত্বরে মানুষজন তেমন নেই। দূর থেকে সাফওয়ান ইবনে উমাইরকে দেখা গেল। সে হাতিমের নিচে বসে আছে। সে তার পাশে গিয়ে বসল। দুজনের চোখে-মুখেই চরম হতাশা। উমাইরই প্রথম কথা বলল। সে বদর-যুদ্ধে কুয়োয় নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বর্ণনা করল। তখন সাফওয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম, এদের নিহত হওয়ার পর আমাদের বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।'

উমাইর তাকে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আল্লাহর কসম, যদি আমার ওপর এমন ঋণের বোঝা না থাকত—যা পরিশোধ করার কোনো ব্যবস্থা আমার নেই। আর যদি আমার সন্তানাদি না থাকত আমার অবর্তমানে যাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে আমি গিয়ে অবশ্যই মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। আরও কারণ হলো, আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী।'

সাফওয়ান যেন যাদুর কাঠি পেয়ে গেল। এরকম সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক না। টাকা খরচ করা সহজ, প্রাণ বিসর্জন দেওয়া কঠিন। মুহাম্মাদকে সে নিজেও হত্যা করতে চায়।

এখন তাকে হত্যা করতে যাওয়া মানেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। সাফওয়ান দ্রুত বলে উঠল, 'তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার, তোমার পক্ষ থেকে আমি তা পরিশোধ করব। তোমার সন্তানেরা আমারা সন্তানদের সঙ্গে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের দেখাশোনা করব। আমার থাকবে আর তারা পাবে না, এমনটি কখনো হবে না।'

সাফওয়ানের কথায় উমাইরের মনে আশা জেগে উঠল। মুহাম্মাদকে হত্যা করা সহজ নয়। এতে যদি তার প্রাণও যায়, তবু তার আফসোস থাকবে না। তার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, পরিবারের ভরণ-পোষণ আর ঋণের বোঝা। সাফওয়ান যখন এ দায়িত্ব নিচ্ছে, তখন আর চিন্তা নেই। এজন্য উমাইর বলল, 'তাহলে বিষয়টি আমার আর তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক! তুমি কী করতে যাচ্ছ, আর আমিই বা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি—কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলো না।'

সাফওয়ান বলল, 'তা-ই করব।'

দুজনের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। উমাইরের আর দেরি করতে চাচ্ছে না। তখনই তারা সেখান থেকে উঠে পৃথক হয়ে গেল এবং এর পরিণতি দেখার আশায় থাকল।

সাফওয়ান অনেকটা নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরলেও উমাইরের সেই সুযোগ নেই। তার কাজ অনেক কঠিন। মনে উত্তেজনা কাজ করছে। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কি না—সে জানে না। আপাতত সে ভয়-ভীতিকে পাত্তা দিতে চায় না। বাড়িতে গিয়েই সে সফরের প্রস্তুতি শুরু করল। নিজের তরবারিতে বিষ মিশিয়ে ধার দিতে লাগল। যখন মনঃপুত হলো, তখন ক্ষান্ত

হলো। এই তরবারিই তার সম্বল। বাহ্যিকভাবে সে ছেলেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে। আর সুযোগ বুঝে মুহাম্মাদকে গুপ্তহত্যায় মেতে উঠবে। সে মদীনার পথে বেরিয়ে পড়ল।

সময়মতোই উমাইর মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। পথে তাকে কোনো বিপদে পড়তে হয়নি। সে সরাসরি মসজিদে নববীর কাছে এসে থামল। বাইরে উট রেখে সে মসজিদে প্রবেশ করে। মুহাম্মাদকে এখানেই পাওয়া যাওয়ার কথা। দূর থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখলেন; তার দূরদর্শিতার তুলনা ছিল না। তিনি উমাইরের হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বিপদ আঁচ করে ফেলেন। তিনি বলে ওঠেন : 'এই যে কুকুরটি—আল্লাহর দুশমন—উমাইর, সে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে আসেনি। সে-ই তো আমাদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং বদরযুদ্ধে আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনুমান করে শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছিল।'

এই কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। তিনি দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এই যে আল্লাহর দুশমন কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে এখানে এসেছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সম্মতিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব অবাক হলেন। তিনি এটি আশা করেননি। এই লোকটির উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই খারাপ; তাকে দেখেই এটি বোঝা যাচ্ছে। তবে আল্লাহর রাসূল যা দেখেন,

সেটি নিশ্চয়ই তার ধারণার বাইরে। তিনি যেহেতু তাকে কাছে আসতে বলেছেন, এখন আর বিকল্প কিছু করার সুযোগ নেই।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার উমাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি উমাইরের ঝুলন্ত তরবারি তার ঘাড়ের সাথে চেপে রেখে বুকের কাপড় জড়িয়ে ধরলেন এবং সাথী আনসারদের বললেন, 'তোমরা রাসূলের কাছে গিয়ে বসো এবং এ দুরাচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা, একে বিশ্বাস করা যায় না।' তারপর তারা তাকে রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইরের অবস্থা দেখে বললেন, 'উমর, তাকে ছেড়ে দাও।' আর উমাইরকে বললেন, 'উমাইর, আমার কাছে এসো।'

উমাইর রাসূলের কছে গিয়ে বলল, 'সুপ্রভাত।' এটাই ছিল জাহেলী যুগের সম্ভাষণ। উমাইর নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাবে বললেন, 'উমাইর, তোমার সম্ভাষণ অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণের ব্যবস্থা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর তা হলো সালাম, শান্তি—যা হবে জান্নাতীদের সম্ভাষণ।'

উমাইর বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম,আমি এ বিষয়ে এখনই অবগত হলাম।'

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উমাইর, তুমি কী জন্য এসেছ?'

সে বলল, 'আপনাদের হাতে আটক এই বন্দীর মুক্তির জন্য আমি এখানে এসেছি। তার ব্যাপারে দয়া করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, ''তবে তোমার কাঁধে তরবারি কেন?'

এ প্রশ্নে উমাইর পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে যতটা সহজ ভেবেছিল, কোনোকিছুই সেভাবে এগোচ্ছে না। মনে হচ্ছে, মুহাম্মাদকে গুপ্তহত্যার পরিবর্তে সে নিজেই এখন প্রকাশ্য হত্যার শিকার হবে। এজন্য সে একটি উদ্ভট জবাব দিল : 'আল্লাহ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা কি আমাদের কোনো কাজে এসেছে?'

এটি কোনো সন্তোষজনক জবাব নয়। বিষয়টি সে নিজেও জানে। মূলত এ প্রশ্নে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। যা পেরেছে, বলেছে। কিন্তু এভাবে পার পাওয়া গেল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলো, কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

সত্যি করে নিজের উদ্দেশ্য বললেই বিপদ। নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা যায় না। মদীনায় আসার আগে মৃত্যুভয়কে এড়িয়ে যেতে পারলেও এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। অকারণে সে মরতেও চাচ্ছে না। উমাইর কোনোমতে বলল, 'ওই বিষয় ছাড়া আমি আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি।'

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় কণ্ঠে বলা শুরু করলেন : 'কিছুতেই তা নয়, বরং তুমি ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া হাতীমে বসে বদরের কুয়োর নিক্ষিপ্ত

কুরাইশদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলে। তুমি না বলেছিলে, আমার যদি ঋণের বোঝা এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না থাকত, তবে আমি অবশ্যই বেরিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। তখন সাফওয়ান তোমার ঋণ ও সন্তানের দায়িত্ব এই শর্তে গ্রহণ করে যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে। অথচ আল্লাহ তোমার ও তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছেন।'

উমাইরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এটি কেমন করে সম্ভব—মক্কার আলোচনা তার কানে এলো কীভাবে? হুবহু একইরকম! এটি দুনিয়ার কারও কাজ নয়। তার মনে তোলপাড় শুরু হলো। আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত এ তোলপাড় থামল না। সে বলে উঠল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আকাশের ওইসব সংবাদ আমাদের শোনাতেন এবং আপনার ওপর যেসকল ওহী অবতীর্ণ হতো, আমরা তা সবই অবিশ্বাস করতাম। আর এ বিষয়টি আমি ও সাফওয়ান ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। সুতরাং আল্লাহর কসম, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানায়নি। সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর, যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখালেন ও এই স্থানে নিয়ে এলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তার রাসূল।'

সাহাবীরা এ ঘটনা দেখে বিস্মিত হলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা স্বচক্ষে দেখলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। মানুষকে হত্যা করা হয়তো সহজ, কিন্তু উমাইরের মতো লোকদের অন্তকরণে সত্যকে প্রোথিত করে দেওয়া অনেক কঠিন কাজ। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা এই শিক্ষাকেই আঁকড়ে ধরলেন—'একজন মুসলিমের জীবন এমন হওয়া উচিত যেন তাকে হত্যা করতে আসা শত্রুও তার সান্নিধ্য থেকে কিছু হলেও উপকৃত হতে পারে এবং ফিরে যাওয়ার আগে সে যেন ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়।'[৬]

---

[৬] উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামগ্রহণের পর মক্কায় ফিরে যান। রাত-দিন মক্কার অলিতে-গলিতে দাওয়াত দিতে থাকেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার হাতে বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনেন। উহুদ-যুদ্ধের পূর্বে মুমিনদের এই দলটি সঙ্গে করে তিনি আবার মদীনায় চলে যান। মক্কা বিজয়ের পর তার বন্ধু ও সাথী সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও ইসলামগ্রহণ করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে খলীফাকে সহযোগিতা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মিসর অভিযানে তিনি সেনাকমান্ডার হিসেবে মদীনা থেকে সাহায্য-সৈন্য নিয়ে ছুটে যান। ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর আমর রাযিয়াল্লাহুর নির্দেশে তিনি মিসরের বহু এলাকা পদানত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু সুফিয়ান রা.-এর ইসলামগ্রহণ

মক্কায় ইসলামের ঘোরতর শত্রুদের একজন ছিলেন আবু সুফিয়ান। কুরাইশদের প্রসিদ্ধ এই নেতা ইসলামকে ধ্বংস করতে তার চেষ্টার কোনো ক্রটি করেননি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধ ও দাঙ্গ-হাঙ্গমায় তিনি ছিলেন অগ্রনী। গত বিশ বছর ধরে তিনি ইসলামের শত্রুতা করে আসছেন। আল্লাহ তার ভাগ্যকেও সুপ্রসন্ন করেছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে তার ইসলামগ্রহণের ঘটনা সহজ ছিল না।

হিজরতের অষ্টম বছর। এ বছর রমাযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা-বিজয় অভিযানে বের হন। এক সময় তারা মক্কার কাছকাছি মাররুয যাহরানে এসে পৌঁছেন। তখন সূর্য ডুবে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই যাত্রাবিরতি করেন। মুসলিম বাহিনীকে বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দেন। এর সঙ্গে তার আরেকটি নির্দেশ ছিল : প্রত্যেক সাহাবীকে কাঠ সংগ্রহ করে নিজ অবস্থানে আগুন জ্বালাতে বলেন।

কুরাইশরা এ অভিযানের কিছুই টের পায়নি। কিছুদিন আগে বনু খুযাআর ঘটনায় মক্কায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়ে মুসলিমদের হুদাইবিয়ার চুক্তির

ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। এ আশ্বস্ততায় কেউ কান দেয়নি। চুক্তি একবার ভঙ্গ করলে সেটি আর বহাল থাকে না। আবু সুফিয়ান কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন। এখন দীর্ঘদিন যাবত মদীনা থেকে কোনো খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য মক্কার কুরাইশরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পরিশেষে তারা আবু সুফিয়ান এবং হাকিম ইবনে হিযামকে মদীনার দিকে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিল। তারা বলল, 'যদি তোমরা মুহাম্মাদের সাক্ষাৎ লাভ করো, তাহলে আমাদের জন্য নিরাপত্তা চাইবে।'
দুই বন্ধু মদীনার পথে রওনা হলেন। মরুভূমির বিশাল পথ। পথের ক্লান্তি থেকে তাদের মনে ভিন্ন কৌতূহল কাজ করছে। তারা মুসলিমদের করুণা ভিক্ষা করতে যাচ্ছে। ব্যাপারটি সত্যিই অদ্ভুত। কিছুতেই তাদের দমন করা গেল না। উল্টো তারাই এখন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মালিক বনে গেছে। তাদের করুণা ছাড়া মক্কায় বেঁচে থাকাও মুশকিল হয়ে পড়েছে। তারা মক্কা আক্রমণ করলে সব ছারখার করে দেবে।

বেলা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। এর মধ্যে পথে তারা বুদাইল ইবনে ওয়ারকার দেখা পেল। তাকেও তারা সঙ্গে নিল। এখন তারা তিনজন। পথ চলতে চলতে মাররুয যাহরান এলাকায় এসে পৌছল। ইতোমধ্যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে তাদের দৃষ্টি আটকে গেল। হাজার হাজার তাঁবু আর অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে সমুদ্রের মতো বিশাল মনে হচ্ছে কাফেলাটাকে। কারা এরা?

আবু সুফিয়ানের আগমনের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনে গেছেন। তিনি সাহাবীদের ডেতে দ্রুত তাকে ধরার নির্দেশ দিলেন। আবু সুফিয়ান যে এখন 'আরাক' অঞ্চলে অবস্থান করছেন, সেটিও তাদের বললেন।

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা মুসলিম বাহিনীর বিশাল কাফেলার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করছে। কিছু টের পাওয়ার আগেই তারা হঠাৎ করে বন্দী হয়ে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতায় তাদের কিছু করাও ছিল না। এখন তাদের উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আবু সুফিয়ানের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়েই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটলেন। এদিকে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বিপদ আঁচ করতে পারলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে সময় দিতে চাচ্ছেন না। দ্রুত কিছু একটা করে ফেলতে চান। রাসূলের অনুমতি ছাড়া করতেও পারছেন না। কিন্তু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ানকে একটু সময় দিতে চান। হয়তো মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা এবং নিজের অসহায়ত্ব বুঝে আবু সুফিয়ান ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেবে। তিনিও দ্রুত রাসূলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

আবু সুফিয়ানের সামনে সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং এখন এর বিকল্প কিছু নেই; আবু সুফিয়ান, মক্কার বিশাল প্রতাপশালী নেতা এখন নতুন জীবনে প্রবেশ করছেন। দীর্ঘ আলাপচারিতার পর অবশেষে তার ঠোঁট থেকে এ বাক্যগুলো শোনা গেল : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

আবু সুফিয়ান ছিলেন সর্দার মানুষ। জাহেলী যুগের সর্দার মানেই সকল অপকর্মের নেতা। শয়তান তাকে এত সহজে

ছাড়ল না। সে তাকে প্ররোচনা দিতে লাগল। এ প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা মাথা বিগড়ে গেল। তিনি আশেপাশের গোত্রের সহযোগিতায় রাসূলকে আক্রমণ করার চিন্তা শুরু করেন। আর তখনই তিনি তার কাঁধে একটি হাতের উপস্থিতি টের পান। তিনি শুনতে পান : 'তাহলে আল্লাহ তোমাকে চরম অপমানিত করবেন এবং আমরা আবার বিজয় লাভ করব।'

আবু সুফিয়ান পাশ ফিরে তাকাতেই দেখেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন। আর তার কাঁধে রাসূলেরই হাত। তার অন্তরের কথা অন্য কারও তো জানার কথা নয়! এটি নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মুহূর্তেই শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন এবং বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি, আমি তার নিকট আমার অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছি! আমি আপনার নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম, আমি বিষয়টি নিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলাম—এখন সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে! আল্লাহর কসম, আমার অন্তরে যা উদয় হয়েছিল, তা ছিল শয়তানের ওয়াসাওয়াসা এবং আমার জাগতিক অন্তরের দুর্বলতা!' তখন থেকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেন।[৭]

---

[৭] ইসলামগ্রহণের পর আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু অতীত জীবনের জন্য অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের বিধি-বিধান ও উপদেশাবলী অনুধাবনে অতিবাহিত করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রাযিয়ল্লাহু আনহুর যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আবু সুফিয়ান জান্নাতের অধিবাসী যুবকদের নেতা।' (*আল-ইসাবা*, ৪/৯০)

তুফাইল ইবনে আমর রা.-এর ইসলামগ্রহণ

ইয়েমেন—মক্কা থেকে সাতশ মাইল দূরে একটি দেশ। এ দেশের একটি শক্তিশালী গোত্রের নাম দাওস। এ গোত্রের সর্দার হচ্ছেন তুফাইল। জাহেলী যুগে বিবেক, ব্যক্তিত্ব কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হতো না বললেই চলে। এর মধ্যেও কিছু মানুষ ব্যতিক্রম ছিলেন। তাদের তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও আত্মমর্যাদাবোধের সবাই প্রশংসা করত। তাদের মধ্যে তুফাইল অন্যতম। তিনি ভাষা-পণ্ডিতও ছিলেন। কাব্য প্রতিভা ছিল তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। সর্দার হিসেবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতেন এবং সাহায্য করতেন। মেহমানদের জন্য তার বাড়ি ছিল সরাইখানা—রাত-দিন কখনো চুলো থেকে হাঁড়ি নামত না।

তুফাইল ব্যবসায়ী ছিলেন। এজন্য প্রায়ই তার মক্কায় আসা-যাওয়া করতে হতো। একবার তিনি মক্কায় এলেন। এসেই নতুন এক বিপদে পড়লেন। এ বিপদ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেছেন। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছেন। আর মুশরিক কুরাইশরা চরমভাবে এর বিরোধিতা করছে। তুফাইল এমন এক সময় মক্কায় এসে পৌঁছেছেন—যখন এ বিরোধ সবচেয়ে মারত্মক আকার ধারণ

করেছে। কুরাইশরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গড়ে তুলেছে। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা-চৌকি স্থাপন করেছে। এসব চৌকির লোকজনের কাজ হচ্ছে, শহরের বাইরে থেকে আসা বণিকদের মুহাম্মাদ সম্পর্কে সতর্ক করা। তারা তুফাইলেরও গতিরোধ করে। তারা প্রথমে তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে। সর্বোত্তম সম্ভাষণে স্বাগত জানায় এবং আতিথেয়তার প্রস্তাব দেয়।

তুফাইলের কাছে কুরাইশদের এ আচরণ অদ্ভুত লাগে। মক্কার পরিস্থিতি সম্পর্কে তার জানা ছিল না। পরে নেতৃবৃন্দের কথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। তারা তাকে বলে, 'হে তুফাইল, আপনি আমাদের শহরে এসেছেন—স্বাগত! আমাদের মধ্যে আপনি এই লোকটি—যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে, সে আমাদের জীবন-সংসার কী এক মায়াজালে পেঁচিয়ে বড় কঠিন করে ফেলেছে। আমাদের ঐক্যের সকল রজ্জুকে সে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সে আমাদের সাজানো-গোছানো সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। তার সকল কথাবার্তা জাদুর মতো। তা ছেলে ও পিতার মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, ভাই ও বোনের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি, আপনার নিজের ও কওমেরও না-জানি আমাদের দশা হয়! তাই সাবধান! আপনি তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। তার কোনো কথাও আপনি শুনতে যাবেন না।'

মক্কার কুরাইশদের এ প্রচেষ্টায় তুফাইল খুব অবাক হলেন। একটা মানুষকে নিয়ে এত হইচইয়ের কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। তবে লোকটি নিশ্চিতভাবেই খুব প্রভাবশালী। তা না হলে তাকে ঠেকাতে কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এত

মরিয়া হয়ে উঠত না। ব্যাপারটিকে এখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। ভয়ও লাগছে। অহেতুক কোনো ঝামেলায় তিনি পড়তে চান না।

তুফাইল মক্কায় এসে কাবা তাওয়াফ করতেন। সেখানে রক্ষিত মূর্তিসমূহের পূজাও করতেন। এবারও এজন্য কাবা-চত্বরের দিকে রওনা হলেন। তবে রওনা হওয়ার আগে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলেন। কানে ভালো করে তুলো ভরে নিলেন—যাতে কোনোভাবেই মুহাম্মাদের কথা কানে না আসে।

তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, তা-ই হলো। কাবা-চত্বরে ঢুকতেই দূর থেকে মুহাম্মাদকে দেখতে পেলেন। তিনি কাবা-চত্বরের পাশে নামায পড়ছেন। তার নামায দেখেই তুফাইল আকৃষ্ট হয়ে গেলেন। এ তো তাদের নামাযের মতো নয়। তুফাইলের মনে ঝড় বয়ে গেল। তার আরও কাছে যেতে ইচ্ছে হলো। ইচ্ছেটাকে আটকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তিনি এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেলেন। কানে তুলো দিয়ে বাইরের শব্দ একটু কমানো যায়; পুরোপুরি বন্ধ করা যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তুফাইলের কানে সেই তিলাওয়াত ভেসে আসে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতে থাকেন। এতে তিনি ভীষণভাবে আলোড়িত হন। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন : 'আমি কেন আমার কান বন্ধ করে আছি? আমি আরবের এত বড় একজন বিচক্ষণ কবি! আর আমি কিনা বুঝব না কোনটি ভালো আর কোনটা মন্দ? তবে এই লোকটির কথা শুনতে সমস্যা কোথায়? যদি তার কথা ভালো হয় তাহলে তা গ্রহণ করব। আর যদি মন্দ হয় তবে দূরে ছুড়ে ফেলে দেব।'

বিষয়টি মোটেও মন্দ নয়। তিনি তা ছুঁড়ে দিতেও পারলেন না। বরং গভীর আকর্ষণে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। রাসূল নামায শেষে বাড়ির পথ ধরেছেন। তুফাইল তাকে অনুসরণ করছেন। অদ্ভুত ঘটনা। তুফাইল নিজেও আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না। ঐশী নির্দেশ না হলে এরকম ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না। রাসূল ঘরে প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গে তুফাইলও। এই প্রথম তিনি রাসূলের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার কাওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছে। তারা আপনার সম্পর্কে এত ভয় দেখিয়েছে যে. আপনার কোনো কথা যাতে আমার কানে না ঢুকতে পারে, সেজন্য আমি কানে তুলো ভরে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ আপনার কিছু কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। যা শুনেছি, ভালোই মনে হয়েছে। আপনি আমার নিকট ইসলামকে তুলে ধরুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব আনন্দিত হলেন। তিনি তার নিকট ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন এবং তারপর কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। এটি ছিল সবচেয়ে চমৎকার ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি—যা ইতিপূর্বে তুফাইল কখনো শোনেনি! ওই দিন পর্যন্ত এর সৌন্দর্যের কাছাকাছিও কিছু তিনি পাননি। তিনি সেখানেই আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষণা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

---

[৮] ইসলামগ্রহণের পর তুফাইল রা. নিজের গোত্রে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তিনি রাসূলের খেদমতে দাওস কবীলার আশিটি পরিবার নিয়ে হাজির হন। এতে রাসূল সা. খুব খুশি হন। তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে রিদ্দার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

যিমাদ আযদী রা.-এর ইসলামগ্রহণ

যিমাদ আযদী—ইয়েমেনের বাসিন্দা। আযাদ শানুআ গোত্রের সন্তান। ঝাড়-ফুঁক করেই জীবিকা অর্জন করতেন। একবার এক কাজে তিনি মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মূর্খ লোক তাকে ঘিরে ধরে। তিনি কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেয় এবং বলে, 'নিশ্চয় মুহাম্মাদ জ্বিনগ্রস্ত লোক!'

এ কথা শুনে যিমাদ খুশিই হন। তার চেহারায় হাসির দ্যুতি ফুটে ওঠে। উপস্থিত মূর্খরা এর কোনো কারণ খুঁজে পেল না। তিনি মনে মনে বললেন, 'আমার অবশ্যই এই লোকের নিকট যাওয়া উচিত। সম্ভবত আল্লাহ আমার হাতে লোকটিকে ভালো করে দেবেন।'

একদিন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কোনো ভূমিকা ছাড়াই যিমাদ বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি তো জ্বিনগ্রস্তদের ঝাড়-ফুঁক করি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, আমার হাতে সুস্থ করেন। আপনার কি ঝাড়-ফুঁক লাগবে?'

রাসূলের সঙ্গে তার কোনো পূর্ব পরিচয় নেই। কোনো পরিচয় পর্ব ছাড়া এভাবে কেউ কথা বলে না। জ্বিনগ্রস্ত লোকের সঙ্গে

এ পর্বের কোনো প্রয়োজনও মনে করেননি যিমাদ। তিনি ধরেই নিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বিনগ্রস্ত। তিনি তাকে এমন এক প্রস্তাব দিয়েছেন, যা সত্যিই অদ্ভুত। তার জন্যই আসলে ঝাড়-ফুঁক বেশি দরকার। সেটি কীভাবে করতে হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে ভালো করেই জানেন। তিনি যিমাদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য; আমি কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, আর তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি যাকে হেদায়েতের পথ দেখান তাকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা কারও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তার কোনো শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

যিমাদ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কী কথা শুনছেন তিনি! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো আরও কিছু বলতেন। কিন্তু যিমাদ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কথাগুলো আবার বলুন। ওগুলোর প্রভাব তো গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার নয়; বরং তিনবার বললেন। বিস্ময়ে অধীর হয়ে যিমাদ বলে উঠলেন, 'জীবনে আমি বহু জ্যোতিষী, জাদুকর ও কবির কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার কথার মতো কথা কোনোদিন শুনিনি। এ অনুভূতির প্রকাশ ও সৌন্দর্য অনিঃশেষ সমুদ্রের গভীরতার মতো! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বাইআত হব।' তার দিকে রাসূলের পবিত্র হাত সম্প্রসারিতই ছিল। যিমাত তখনই মুসলমান হয়ে গেলেন।

আবুল আস ইবনে রাবী রা.-এর ইসলামগ্রহণ

মক্কায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক পাওয়া দুষ্কর। অপকর্মে ডুবে থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্ব থাকে না। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও কাজ করে না। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী যুবক আবুল আস। বংশগৌরব, বীরত্ব এবং ব্যক্তিত্বে অনন্য। ব্যসায়ী মানুষ। মক্কা ও শামে সব সময় তার বাণিজ্যিক কাফেলা চলতই। এসব কাফেলায় কম করে হলেও একশ উট থাকত। আর লোকবল থাকত দুশো। তার সততা ও আমানতদারীর প্রশংসা করত সবাই। এজন্য ব্যবসায়ে উন্নতি করতে তার সময় বেশি লাগেনি। আর সেটি ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

তিনি ছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের আগেই যায়নাবকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন। তারপর যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন আবুল আস স্বধর্মেই বহাল থাকেন। ইসলামে তখনো বিধর্মীর সাথে বিবাহ হারাম না হওয়ায় তাদের সংসার টিকে গেল। তবে বেশিদিন এ অবস্থা থাকল না। বদর-যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল।

আবুল আস বদর-যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে বেঁচে গেলেও বন্দী হলেন। মুক্তিপই দিয়ে মুক্তিও পেয়ে গেলেন।

তবে তার মুক্তিপণের ঘটনা খুব করুণ। তার প্রতি মহীয়সী নারী যায়নবের ভালোবাসা ছিল অনেক। তিনি তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে অর্থকড়ি না পাঠিয়ে নিজের গলার একটি হার পাঠালেন। এ হার দেখেই রাসূলের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এটি তার প্রয়াত স্ত্রী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার। যায়নাবের বিয়ের সময় তিনিই তার মেয়েকে এ হারটি দিয়েছিলেন। খাদিজার চেহারা মানসপটে ভেসে উঠলে রাসূল অন্যরকম হয়ে যেতেন। তার চোখ ছলছল করে উঠত। এই বুঝি অশ্রুর প্লাবন শুরু হবে। হারটি দেখেই তিনি চেহারা ঢেকে ফেলেন। রাসূলের আবেগ খুব কমই চোখে পড়ত। এটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল তার। এই এক জায়গায় তার ভালোবাসা বাধ মানত না। তিনি তার প্রিয় সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা যদি চাও তাহলে যয়নাবের স্বামীকে মুক্ত করে দিতে পার এবং এ হারও তাকে ফিরিয়ে দিতে পার।' আহ! এরকম অনুরোধ অন্য কারও ব্যাপারে করেছেন কি না জানা নেই। এতে আবুল আস যত না উপলক্ষ, তার চেয়ে বেশি ছিল সেই হার।

আবুল আস মুক্তি পেয়ে গেলেন। মক্কায় যাওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কানে কানে কিছু একটা বললেন। কি বলেছেন, কেউ শোনেনি। কিন্তু এতে আবুল আস সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মক্কায় গিয়েই স্ত্রীকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ টিকল না। ইসলামে নতুন বিধান চালু হয়েছে। মুশরিকদের সাথে আর কোনোদিন কোনো মুসলিম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। যায়নাব মদীনায় এলেন। তবে তার আসার পথটা ছিল কঠিন। মক্কার মুশরিকরা বাধা দিল। এতে তিনি আহত হলেন। অন্তঃসত্ত্বা থাকাতে তার গর্ভপাত হয়ে গেল। আমৃত্যু তিনি এই যাতনা সহ্য করেন।

সময় যায়। আবুল আসের এখন নিঃসঙ্গ জীবন। যায়নাব অনেক অনুনয়-বিনয় করেও স্বামীকে মদীনায় আনতে পারেননি। দুজন দুপ্রান্তে একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। এ দূরত্ব যেন কাছে টানারই আবহ সৃষ্টি করল। কয়েকবছর পর তারা আবার পরস্পরের দেখা পেলেন। তবে এবার ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা। একবার কুরাইশদের একটা বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে আবুল আস সিরিয়া যান। সেখান জিনিস-পত্র কিনে মক্কায় ফিরছিলেন। কাফেলাটি যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে, তখন মুসলমানরা খবর পেয়ে এ কাফেলার সবাইকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসে। আবুল আসকে মুসলমান হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। যয়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা আবুল আসের খবর পেয়ে দৌড়ে মসজিদে এসে ঘোষণা করলেন, 'হে লোকসকল, আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

এ নিরাপত্তায় তখন বাধা দেওয়র সুযোগ ছিল না। কোনো মুসলিম কাউকে নিরাপত্তা দিলে সেটি কার্যকর করা হতো। যায়নাব যে আবুল আসের নিরাপত্তা দিয়েছেন, বিষয়টি রাসূলও জানতেন না। সকালে ফজরের নামাযের পর ঘটনাটি জানাজানি হয়। সাহাবীরাও মেনে নেন। এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল আসের জন্য সাহাবীদের বিশেষ অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমরা পুরো ঘটনা জানো। তোমরা তার বাণিজ্য-সম্ভার তাকে ফেরত দিতে পার এবং তাকে ছেড়ে দিতে পার। এটা আমি পছন্দ করি। আর যদি তোমরা চাও তাহলে তার সম্পদ নিয়ে নিতে পার এবং ব্যবহারও করতে পার। এটা যেহেতু গনীমতের মাল, এজন্য তোমাদের সে অধিকার আছে।'

সাহাবীরা তো রাসূলের সন্তুষ্টিতেই জীবনের সফলতা খুঁজতেন। তারা রাজি হয়ে গেলেন। তখন অবশ্য কেউ কেউ আবুল আসকে ইসলামগ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এই মালামালসহ মদীনায় থেকে যাওয়ার পরামর্শও দেন। আবুল আস তখন জবাব দিলেন, 'আমি আমার নতুন জীবন শঠতার মাধ্যমে শুরু করতে পারি না।' তিনি মালামালসহ মক্কায় ফিরে গেলেন।

আবুল আস মক্কায় পৌঁছে এক এক করে সবাইকে তাদের মাল বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, আমার কাছে তোমাদের আর কোনো পাওনা আছে কি?' তারা বলল, 'না। আমরা তোমাকে খুব ভালো প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পেয়েছি।' আবুল আস বললেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। আমাকে যে জিনিস এতদিন পর্যন্ত এ ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে সেটা হলো, তোমরা ধারণা করতে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন করেছি। আল্লাহ আমাকে তোমাদের মাল ফিরিয়ে দেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। তোমাদের আর কোনো কিছুই আমার কাছে নেই। এখন আমি মুসলমান হয়ে গেছি।'

আবুল আস মক্কা এবং মক্কাবাসীদেরকে বিদায় জানিয়ে সরাসরি মদীনায় চলে আসেন। তিনি মসজিদে নববীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানেই নিজের ঈমান এবং রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের ঘোষণা দেন।

সুহাইব ইবনে সিনান রা.-এর ইসলামগ্রহণ

জাহেলী যুগের পৃথিবী। মানুষ এখনো সভ্যতার আলো দেখেনি। রোম-পারস্য দাপুটে সাম্রাজ্য। নিজেদের সভ্য দাবি করলেও আসলে তাদের জানা নেই—কতটা অসভ্য তারা। এরকম অসভ্যদের আক্রমণ-অত্যাচারে প্রায়ই স্বাধীন মানুষ দাস হয়ে যেত। একবার দাস হয়ে গেলে তাকে আর মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। সে অন্যান্য পোষা প্রাণীর মতো সমাজে বেঁচে থাকত এবং তাকে হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করা হতো। এরকম এক বাজারে পাওয়া গেল সুহাইবকে।

সিনান ইবনে মালিক শাসক মানুষ। প্রাচীন শহর উবুল্লার শাসক। পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এমনিতে জন্মেছিলেন আরবে। তার গোত্রের নাম ছিল বনী নুমাইর। সুহাইব তার-ই সন্তান। বয়স পাঁচের বেশি হবে না। গভীর মায়া ও যত্নে তিনি বেড়ে উঠছেন। কিন্তু মায়ার এ বন্ধন তার ভাগ্যে ছিল না। তিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শিশু বয়সেই দাস হয়ে ওঠেন। মায়ের সঙ্গে গেছিলেন ইরাকের সানিয়া পল্লীতে বেড়াতে। বেড়ানো আর হয়নি। রাতে রোমান বাহিনী পল্লীতে আক্রমণ করে। লুটতরাজ করে। নারী ও শিশুদের বন্দী করে। তখন বন্দী মানেই দাসত্ব বরণ করে নেওয়া। সুহাইবও বন্দী হলেন। পাঁচ বছর বয়সেই রোমের বাজারে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গেলেন।

সুহাইবের নতুন জীবন শুরু হলো। রোমের ভূমিতে তিনি বেড়ে উঠতে লাগলেন। দাস হিসেবে বেড়ে ওঠা—যে জীবনের কেউ খোঁজ রাখেনি। সময় থেমে থাকে না। বছরের বছর পার হয়ে গেল। সুহাইব যৌবনে পদার্পণ করেছেন। জন্মেছিলেন আরব পরিবারে। মরুর সন্তান। ভাষা ছিল আরবি। সেটি তিনি এখন আর মনে করতে পারেন না। তবে এক মুহূর্তের জন্য আরবকে ভুলে যাননি। মনে খুব আশা—একদিন দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবেন। তবে সেই দিন কবে আসবে, জানা নেই। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

অনিশ্চিত জীবন। কঠিন সময় যাচ্ছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তার বেড়েই চলছে। এর মধ্যে এক খ্রিস্টান ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে তার দেখা হলো। তখনকার ভবিষ্যদ্বক্তারা বেশিরভাগই ছিল ভণ্ড। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের নিকট থেকে অর্থকড়ি হতিয়ে নেওয়া। এ লোকটি সেরকম ছিলেন না। তার কথাবার্তায় জ্ঞানের প্রভাব ছিল। তিনি বললেন, 'সে সময় সমাগত যখন জাযীরাতুল আরবের মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের নবুওয়াতকে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন।' এটি অবশ্যই নতুন একটি খবর। এ খবরে সুহাইবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

যুবক বয়সে যে কোনো সাধনাই কাজে লেগে যায়। সুহাইবের একটাই সাধনা—একটা মোক্ষম সুযোগ। এ সুযোগে তিনি পালাবেন। দাসত্বের এ শৃঙ্খল তার আর ভালো লাগছে না। সাধনা কাজে দিল। তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন। একদিন ঠিকই মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেন। পালিয়ে সরাসরি মক্কায় চলে এলেন। খ্রিস্টান ভবিষ্যদ্বক্তার কথা ফলবেই। এ আশাই তাকে মক্কায় টেনে আনে।

মক্কায় তিনি নতুন। মাথায় সোনলী চুল। আরবিও ঠিকমতো বলতে পারেন না। মক্কার লোকেরা এই নতুন মানুষটিকে দেখে অবাক হয়। তারা তার নামের শেষে একটা উপাধি জুড়ে দেয়। তার নাম হয়ে ওঠে সুহাইব আর-রুমী। ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার সঙ্গে চুক্তি করে তিনিও ব্যবসা শুরু করেন। তিনি দ্রুত ব্যবসায় সফল হয়ে ওঠেন। প্রচুর অর্থ-কড়ির মালিক হন।

ব্যবসায়িক ব্যস্ততার মধ্যেও সুহাইবের সেই খ্রিস্টানের ভবিষ্যবাণী ভুলে যাননি। একদিন তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করতেন। এখনো সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়নি। এবার মুক্তি দাসত্ব থেকে নয়—অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান করছেন তিনি। কবে আসবেন সেই নবী? অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হচ্ছে না। তবে আর বাকিও বেশি ছিল না।

একদিন সফর থেকে ফিরেই মক্কায় একটি শোরগোল শুনতে পেলেন। লোকেরা আলোচনার নতুন বিষয় পেয়েছে। এই নিয়েই শোরগোল হচ্ছে। তিনি শুনলেন, তারা বলছে, ‘মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নবুওয়াত লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। তাদের আদল ও ইহসানের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সুহাইবের আনন্দের সীমা থাকে না।’

এই মানুষটির জন্যই তিনি বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছেন। তবুও তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হতে চাইলেন।

সুহাইব লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'যাকে আল-আমীন বলা হয়, তিনিই কি সেই ব্যক্তি?'

লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ।'

'তার বাসস্থান কোথায়?'

'সাফা পাহাড়ের কাছে আল-আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে তিনি থাকেন। তবে সতর্ক থেকো, কুরাইশদের কেউ যেন তোমাকে তার কাছে দেখে না ফেলে। যদি তারা তা দেখে, তাহলে তারা তোমার সাথে তেমন আচরণই করবে যেমনটি তারা আমাদের সঙ্গে করে থাকে। তুমি তো ভিনদেশি মানুষ। তোমাকে রক্ষা করার এ শহরে কেউ নেই। তোমার গোত্র-গোষ্ঠীও এখানে নেই।'

সুহাইব এতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। তাকে সেখানে যেতেই হবে। তিনি দারুল আরকামের দিকে রওনা হলেন। গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। পথের শেষ প্রান্তে এসে নিজেকে আর গোপন রাখতে পারলেন না। সামনেই আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে। সেও একই পথে হাঁটছে। মানুষটিকে তিনি চেনেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির। কিন্তু সে কোথায় যাচ্ছে? কাছে গেলেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধা লাগছে। প্রথমে আম্মারই তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ হে?'

সুহাইব প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই দিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি একা একা কোথায় যাচ্ছ?'

আম্মার বললেন, 'আমি মুহাম্মাদের কাছে যেতে চাই এবং তার কথা শুনতে চাই।'

এ কথা শুনে সুহাইব বললেন, 'আমিও একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

তারপর তারা দুজন একসঙ্গেই দারুল আরকামে প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনলেন। একসঙ্গেই ঈমানের ঘোষণা দিলেন।[৯]

---

[৯] সুহাইব ইবনে সিনান আর-রুমী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ইসলামগ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ফলে তাকে কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হতে হয়। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করেন। রাসূলের সঙ্গে হিজরত করার ইচ্ছা থাকলেও তা পারেননি। কুরাইশরা তার পিছু লেগে ছিল, যাতে তিনি তার বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে সরে যেতে না পারেন। অবশেষে দ্বীনের খাতিরে সবকিছু ত্যাগ করে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ ও দানশীল। গরিব দুঃখীর প্রতি ছিলেন দরাযহস্ত। অন্যদিকে সুহাইব ছিলেন দক্ষ তিরন্দায। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী ছিলেন। তার সম্পর্কে উমর রা.-এর অত্যন্ত সুধারণা ছিল। মৃত্যুর পুর্বে তিনি অসীয়ত করে যান—সুহাইব তার জানাযার ইমামতি করবেন। শুরার সদস্যবৃন্দ যতক্ষণ নতুন খলীফার নাম ঘোষণা না করবেন, তিনিই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। উমর রা.-এর মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী ৩৮ সনে ৭২ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

- ✓ *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
- ✓ রাশীদ হাইলামায, *মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ (১-৩),* অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা।
- ✓ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
- ✓ আল্লামা শিবলী নোমানী, *সীরাতুন নবী সা.,* অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা।
- ✓ মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম,* অনুবাদ মীযান বিন হারুন, দারুল হুদা কুতুবখানা, ঢাকা।

লেখকের অন্যান্য বই

পথের দিশা; একজন আলোকিত মানুষ; সোহবতের গল্প, একা একা আমেরিকা; পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন; প্রফেসর হযরতের সঙ্গে আমেরিকা সফর; সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি; প্রফেসর হযরতের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফর।

সংকলন

কুরআন ও বিজ্ঞান; ইসলাম ও সামাজিকতা; ইসলামে আধুনিকতা; তাবলীগ ও তালীম; পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনী অনুভূতি; মুমিনের সফলতা; An Appeal to Common Sense।

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ (১-৩); প্রথম মুসলিম এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি খাদিজা রা.; জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা.; রাসূল সা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ; জীবন ও কর্ম: আবু বকর রা. (১-২); জীবন ও কর্ম : উমর রা. (২য় খণ্ড); জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা. (১-২); জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (২-৩); মুনাজাতে মাকবুল; পিচ্ছিল পাথর।

উল্লেখ্য, সবগুলো বই মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনটাই ত্যাগ ও সাধনার অপূর্ব শিল্প, মহিমামণ্ডিত গল্প। এর মধ্যে তাঁদের ইসলাম গ্রহণ, শাহাদাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাচর্য লাভের হিরন্ময় মূহুর্ত এবং দ্বীনের জন্য জীবনের ত্যাগ জীবনের অসাধারণ এক-একটি অধ্যায়। বুযুর্গদের সোহবত-ধন্য প্রিয় লেখক মুহাম্মাদ আদম আলী তার সুখদ স্বাদু গদ্যে লিখেছেন বারোজন সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের গল্প। গল্পের গদ্য ও ঘটনা দুটোই পাঠকের চোখ টেনে নিয়ে যায়। উপকারী ও স্বাদু এই *সাহাবীদের ইসলামগ্রহণের গল্প* বইটি থেকে সবশ্রেণির পাঠকই উপকৃত হতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

—শরীফ মুহাম্মাদ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সম্পাদক, ইসলামটাইমস২৪.কম